আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

প্রকাশকঃ
অধ্যক্ষ ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী

মুদ্রকঃ
সূর্য্যা ইনফোটেক

প্রচ্ছদ অঙ্কনঃ সন্দীপ শেখর সিন্‌হা

সম্পাদনায়
কৌশিক দে
পীযূষ মৃধাজ্জী

প্রচ্ছদ মুদ্রণঃ

প্রচ্ছদঃ
এবয়স জেনো ভীরু কাপুরুষ নয়
এবয়স জানে বুক বেধে পথ এগোতে,
হাতের মশাল শক্ত মুঠোয় ধরেও
এবয়স জানে শুভেচ্ছা ফুল পাঠাতে॥

সম্পাদনা সহযোগী
অনিরুদ্ধ দে
সন্দীপন রায়
ঈপ্সিতা সেনগুপ্ত
অয়ন সরকার
অরিজিৎ বালা
অনির্ব্বান লাহিড়ী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
অধ্যাপক শ্রী অমৃতাভ ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক শ্রীরাই কমল দাশগুপ্ত
অধ্যাপিকা শ্রীমতি রূপা ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপিকা শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়
অরিন্দম ঝা
সূর্য্যা ইনফোটেকের কর্মীবৃন্দ

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

অধ্যক্ষ ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী

প্রতিবছরের মতো এবারেও ছাত্রসংসদ তাদের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরেও বেশ কিছু লেখা ছাত্রছাত্রীদের সৃজন ক্ষমতার প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। ছাত্র সংসদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সাফল্যের সজ্জা অঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে যে বার্ষিক প্রত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে তা সকলের কাছে সমাদৃত হবে, এই গভীর আশা রাখি।

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ ১৯৯৪-৯৫

সংসদ বার্তা

১৯৯৪ সালের এক শরতের সকালে, সোনালী সূর্য্যের আলোর মতো ঝকঝকে ৩২ জন তরুণকে নিয়ে ছাত্রসংসদের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সারা ভারতবর্ষের ছাত্র সমাজ যে কলেজের ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে থাকে আমরা সেই কলেজে ছাত্র সংসদ পরিচলনা করেছি কলেজের সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীর যৌথ সহযোগিতায়, আজ একবছর পর আমরা তরে মূল্যায়ণ করতে চলেছি।

সারা দেশে যখন দারিদ্র্য, বেকারী, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের করাল ছায়া নেমে আসছে, যখন মানুষের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সার্বভৌমত্ব, ঐতিহ্য ও আমাদের সুমহান সংস্কৃতির সুবিশাল মহীরুহগুলিকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে যাতে এই দেশটা ধর্মান্ধতা ও জাতপাতের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে রক্তলোলুপ স্বার্থান্বেষী শোষক পরজীবিদের স্বর্গোদ্যানে পরিণত হয়। ঠিক সেই সময়ও আমরা আশুতোষ কলেজের সুস্থ ও প্রগতিশীল পরিবেশ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি।

ছাত্র সংসদ দায়িত্বে আসার পর নবীনবরণ অনুষ্ঠান দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করে এরপর একে একে বার্ষিক ক্রীড়া প্রোতিযোগিতা, কালচারাল কম্পিটিশন, কমনরুম কম্পিটিশন রক্ত দান শিবির আন্তঃ কলেজ ফুটবল কম্পিটিশন, বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের মধ্য দিয়ে কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাদের পরিচয় ঘটিয়ে আগামী ছাত্র সংসদের ওপর তাদের বিকাশের ভার ন্যস্ত করে আমরা আমাদের একবছরের কাজ সম্পন্ন করেছি এই আশা নিয়ে যাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে ক্রীড়াঙ্গন এবং সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা সকল জায়গাতেই থাকে আশুতোষ কলেজের ছাত্রছাত্রী। আশাকরি আমরা সফল হবই।

আশুতোষ কলেজের ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে কৌশিক দে॥

মৃত্যুর করাল ছায়া ঢেকে দিয়েছে তোমার অবয়ব ও স্মৃতির দীপ্তিতে
কিন্তু মনের গভীরে তোমাদের কর্ম ও চিন্তা আজও স্মৃতির দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি

..... পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানব জাতির মুক্তি যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছেন
..... ক্রীড়া ও রাজনৈতিক জগতে যে তারকারা খসে পড়েছেন।
..... পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রাকৃতিক দূর্যোগে ও মহামারীতে যারা প্রাণ হারিয়েছেন।

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ - ১৯৯৪ - ৯৫

সভাপতি
দেবদাস রায়

সহ সভাপতি
অনিন্দ্য সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক
ভাস্কর পাল

যুগ্মসহকারী সাধারণ সম্পাদক
অংশুমান ব্যানার্জী
অরিন্দম বোস

সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মৈনাক ভট্টাচার্য্য

সহকারী সাধারণ সম্পাদক
অয়ন সরকার
শিউলি পাল

ক্রীড়া সম্পাদক
কনিষ্ক রায়চৌধুরী

সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক
(বর্হিবিভাগ)
শ্রীজিত ভৌমিক
অরিজিৎ মজুমদার

সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক
(অন্তর্বিভাগ)
অভীক চৌধুরী
বাপ্পাদিত্য রায়

যুগ্ম গ্রন্থাগার সম্পাদক
বিপ্লব মুখার্জী
ঋত্বিক মুখার্জী

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক
প্রদীপ্ত সান্যাল
পারিজাত সান্যাল

যুগ্ম ক্যান্টিন সম্পাদক
শুভাশীষ ঘোষ
অনিরুদ্ধ দে

অন্যান্য সদস্য
মনীষ মজুমদার
সম্রাট মুখার্জী
অয়ন ব্যানার্জী
মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
সঞ্জয় সরকার
অনিন্দিতা সাহা
কৃষাণ দেব
আনবিক মুখার্জী
দেবযানী পাল
মনিদীপা সেন
উত্তম তরফদার
অসীম রায়
অগ্নি পান্ডে
অমৃতেন্দু প্রামানিক

দিনবদলের দিন আসছে

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আশুতোষ কলেজ ইউনিটের পক্ষ থেকে বলছি। প্রথমেই, আমাদের দীর্ঘকালীন নীরবতা ও শিথিলতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমরা আনন্দিত, যে বিজ্ঞান মঞ্চ-এর ইউনিট আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এটা অনস্বীকার্য, যে দেশের সাম্প্রতিক অন্ধবিশ্বাস, আর সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পে ভরা পরিবেশে, বিজ্ঞান মঞ্চের দরকার আছে। কোন বিশ্বের অন্য সব দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, ভারত, বিদ্যায়, মননে তাদের থেকে বহু বছর পিছিয়ে। এতে শুধু সমাজ নয়, আমাদের জীবনের কেরিয়ারের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে!

ধর্ম নিয়ে ব্যবসা আজ সংগঠিত অপরাধের পর্যায়ে চলে গেছে, আর সাধারণ মানুষ ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছে গেছে। বন্ধু, এই সময়, এই সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। আপনার পাশে বিজ্ঞান মঞ্চ থাকবে এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। আমাদের প্রকল্পগুলিতে যোগ দিন। আমরা কথার চেয়ে কাজ ভালোবাসি, আর এই প্রকল্পগুলিই আপনাকে আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে। 1996, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী, আর এই 1996-তে আমরা আপনাদের সাহায্য চাই, আমাদের প্রকল্পগুলি সফল করতে।

★ আমরা চাই, বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প ও শিবিরের মাধ্যমে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়তে, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে।

★ আশুতোষ কলেজে বিজ্ঞান সচেতনতা ও জনপ্রিয়তা বাড়াতে বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করতে।

★ ধারাবাহিক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ যাতে আমরা আপনাদের মতামত সবসময় পেতে পারি।

★ জৈব প্রযুক্তির হস্তান্তর, পরিবেশ সচেতনতা, প্রভৃতি বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নানা কর্মসূচি নেওয়া।

এই কর্মসূচীগুলির সাফল্যের জন্য আপনাদের সাহায্য চাই। আমাদের ক্লাস প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন, অথবা নিজেরাই এগিয়ে আসুন, আমরা আপনাকে আমাদের পক্ষে যতটুকু সহায়তা সম্ভব, করব।

বিজ্ঞান মঞ্চ (আশুতোষ কলেজ ইউনিট)-এর পক্ষেঃ পার্থ সাহা, অনুপম রায় চৌধুরী, যুথজিত আম্বোলি, শমীক সরকার, ভাস্কর ভট্টাচার্য্য, অনুপম কুন্ডু, অরিন্দম সেন, রাজেশ ভট্টাচার্য্য, সুব্রত দাস, সুমিত মিত্র, সায়ন শূর রায়, নীলাঞ্জন ওহ, রজতশুভ্র ভট্টাচার্য্য, পীযূষ মুখার্জী ও সুস্মিতা নন্দী।

দূরত্বের জবানবন্দী

অংশুমান ভৌমিক
ইংরেজি (অনার্স) প্রথম বর্ষ

শুষ্ক চৈত্রমাস
বসন্তের অন্তিম নির্যাসটুকু আকণ্ঠ পান করে চলেছে,
চৈত্রবারন
উত্তাপের আবরণে ঢাকতে চায় বসন্তের চাঞ্চল্যকে,
নির্জন মধ্যাহ্ন
প্রাত্যহিক অভ্যেসের বাইরে বেরুতে উন্মুখ,
রিক্ত মন
আগ্রহী ধূসর আকাশের বুকে বলাকা হতে,
তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে
সর্বগ্রাসী শূন্যতার মাঝে খুঁজে ফেরে মরূদ্যান,
অস্ফুট আর্তি
তপ্ত মর্ত্যলোকের নিভৃত কোণে নীরব দীর্ঘশ্বাস,
একাকীত্বের গ্লানি
চরাচরব্যাপী হাহাকার পায়না সান্ত্বনা॥

বিপ্লবী

পীযূষ মুখার্জী
বিজ্ঞান বিভাগ, প্রথম বর্ষ

হে মহাজীবন,
শুনতে পাওনা ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ —
দিগন্তে দিগন্তে বাজা মৃত্যুর ডঙ্কা,
স্তব্ধ প্রাণের ওপর দাঁড়িয়ে কোন উদ্ধত
রাজার গগনভেদী বজ্র নিনাদ।

শুনতে পাওনা অত্যাচারিত মানুষের হাহাকার —
সভ্যতার-শ্মশানে শোষিত প্রেতাত্মার অট্টহাস্য,
বর্বর-রাক্ষসের হাতে জীবনের কান্না
অথবা সবুজ প্রান্তরে ধ্বনিত কোন অদৃশ্য মৃত্যু বিভীষিকার।

মাটিতে কান পেতে শোনো,
মৃত্যু বহ জীবনের যন্ত্রনার কথা —
বিত্তশালী মানুষের বিজয়ী পদচারণা,
লক্ষ মানুষের মরণের দীর্ঘশ্বাস
অথবা, সর্বস্বান্তদের বিফল জীবনের ক্রন্দিত ব্যথা।

বিপ্লবী তুমি,
করতে চেয়োনা অসম্ভবেরে সম্ভব —
মৃত্যুকীর্ন মানুষকে দিয়োনা মিছে আশ্বাসবাণী,
মানুষে যা পারে ভালভাবে করো
সেই হবে তোমার শ্রেষ্ঠ বিপ্লব॥

তবে তারা কারা ?

অনিরুদ্ধ দে
IInd yr/B.sc 'c' - 562

আকাশ ভরা সূর্য-তারা,
তার মাঝে, তুমি-তোমরা,
আমি-আমরা,
এর বাইরে কি কেউ আছে ?
তবে তারা কারা ?
যদি বলতে চাও, তবে এখনই বলো,
না, বলবেতো বলো না।
কারণ, আমি জানি তুমি ও তোমরা
বলতে পারবে না।
আমি জানি তারা কারা !
আমি বলতে পারি তারা কারা !
কিন্তু কেন বলবো ?
তুমি বলতে পারবে না কেন ?
তুমিও তো মানুষ।
'ভয়' ! হাঁসি পায়, কিসের ভয় ?
আজতো তুমি, আমি, আমরা সবাই 'ভয়ের' উর্দ্ধে।
কারণ, আমাদের হারাবার কিছু নেই,
তাইতো আমরা চিৎকার করে বলবো আমরা
—'সর্বহারা'
আর ওরা ? যারা একদিন আমাদের মতই ছিল,
কিন্তু আজ ছিনিয়ে নিয়েছে ক্ষমতা,
নিজেদের মত করে স্বপ্নের জগৎ গড়েছে আজ
'তারা'॥

সমাধান

"একাদশ শ্রেনী"
রাজা দাস
রোল - ২৪৪

তোমার ভাল বাসায়
বকুল ঝরা সকাল সন্ধ্যায়
আমার যৌবন কাঁদে
অনিশ্চিত আত্মা প্রতিষ্ঠায়।
অবাঞ্ছিত জীবন যন্ত্রনায়॥

তোমার বিলাসী স্বপ্নে
পরী কথা বলে, পাখী গান গায়, ফুল ফোটে।
আমায় পায়না ওরা॥
রূঢ় মূঢ় বাস্তবতায় আমি হারিয়ে যাই
হেরে যাই বারং বার।

তোমার গোলাপী পাপড়ি ঠোঁটে
মৌমাছি মধু খায়
আমার হিংস্র চোখ
হিংসায় জ্বলে যায়॥

তবু কেন বাদলা রাতে
বৃষ্টি ভেজা স্নিগ্ধ বাতাসে,
তোমার নতুন শাড়ীর গন্ধে,
ভেসে আসে প্রেমের আমন্ত্রণ।

আমি বিস্ময় কর গুনে না দেখি
দুই মাসটা কাবার হতে কত দিন বাকি।

বড়ই কষ্ট হয়, কথা দিয়ে
কারো কথা না রাখা।
জীবনের দীর্ঘ যাত্রা পথ
এত আঁকা বাঁকা কারোর,
থাকে না জানা।
কি সে আসল পথ
কোনটা নিশানা॥

যদি কেন্দ্র হতে বৃত্তটার
ব্যাসার্ধ সমান।
বৃত্ত হতে কেন্দ্রের একই ব্যবধান॥

যেদিন রবনা আমি

কৌশিক দে

যেদিন রবনা আমি তোমাদের সাথে
স্মৃতির শুকনো মালা রবে তোমাদের হাতে,
সেদিন আমার হাসি ছোঁওয়া একটি ছবি
ঝুলবে তোমার বাতায়নে।
তার পানে চেয়ে একটু কেবল অশ্রু বিন্দু
বন্ধু, এনো তোমার নয়নে,
নাইবা দিলে মালা আমায় তুমি
বন্ধু সদ্য ফোটা ফুলে,
পায়ে দলা একটি একটি শুকনো গোলাপ
এনো বন্ধু মোর তরে।

ঘুরে গেছে চিত্রণ

শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়
(B.Sc.Ist yr)

টেবিলের কোণে আমার নীল দুঃখরেখা মুছিয়ে দেয়নি কেউ,
একই ভাবে রয়েছে এলিয়ে।
সমস্ত ঘরটা জুড়ে নদী-নদী ভাব,
বসন্তে, শ্রাবণে কিছু বর্ণময় ভেসে যাওয়া-খেলা,
তেমনটি রয়েছে নিপাট।
কুসুম-সকাল চেঁছে রোদের মাখন বিছানায় মাখিয়ে রাখা আছে;
চাকার চাপে শুধু ঘুরে গেছে চিত্রণ।
একই কুঞ্জে কেবল স্থান বদলের প্ররোচণ
ঘুরে ফিরে আসে;
এই ল্যাম্পপোষ্ট ছেড়ে অন্য ল্যাম্পপোষ্টের পাশে
একরত্তি ঘর ফেঁদে পরিবার উঠে যাওয়া যাবে - যাবেনা এড়ানো।
দেখতে দেখতে কবে ইমারতে লেগে যাবে রঙ.....
ঘুরে গেছে চিত্রণ নির্ঘাত!
চাকার চাপে! মাত্র একটা চাকার চাপে ছিটকোয় ধোঁয়া....
নইলে শ্যামলদা'র সাথে অনিমার বিয়ে - পৃথিবীতে কে আটকাতো!
নইলে অ্যালবামে গ্রুপ ফোটো লাগানোর দিন,
সুনেত্রার হাসিটা আরও ছড়িয়ে দেওয়া যেত অনায়াসে,
-যা স্বপ্ন এহেন দিনকালে।
শুধু চাকার শব্দ বন্‌বন্‌.....
ঘুরে গেছে চিত্রণ বারবার.....
কিন্তু কবিতার বুকে গাঁদাফুলের ছাপ
বালিশের নীচে আমার রাতজাগা প্রেম
বাড়ি বদলের কালে বিক্রী হয়নি একবারও.....

চাওয়া

দেবাশিস্ ভৌমিক
তৃতীয় বর্ষ, পদার্থ বিদ্যা

যখন তুমি আধফোটা ফুলের মতই
সবুজের জগৎ রাঙাতে —
তখন আমি তোমার দর্শনেই দিনভোর কাটাতাম ঐচ্ছিক ভাবনায়।
যখন প্রথম বর্ষণে তোমার পাপড়িগুলি
— হত এলোমেলো,
অবুঝ মন চাইত কাছে আসতে।
আকাঙ্খা থাকলেও, দুঃসাহসের ছিল অভাব।
আর তারপর যখন তুমি পরিপূর্ণ ফুল,
ক্রেতার ময়দানে পূর্ণ মূল্য দিয়ে নিয়ে গেল তোমায়।
আমি তো ক্রেতা নই - নিঃস্ব পিপাসু।
আজ তুমি বাসি ফুল,
সজ্জার চাপে মূর্চ্ছা যাওনি।
আজ সবাই তোমার ক্রেতা হতে পারে।
তবু আমি হব না,
আমি তো তোমার সৌরভ পেতে চেয়েছি।
পাপড়ি সরাতে চাইনি।

নদীতে নতুন জোয়ার

রতন কুমার বিশ্বাস
(Hons Bengali) B.A.
Ist Yr, Roll No - 135

ভাঁটার টানে সেই সকালে চলে গেছে
দু'একজন আর ওঠে নি, যখন
ওঠে নি তখন তো ওরা জীবনের স্বাদ পেয়েছে
একটি সীমার মধ্যে।
আসলে অসীম-ওরাই এই সীমার মধ্যে
অপ্রত্যক্ষ রেখে চলে যায়;
তাই তো জীবনের উষ্ণতা এখানে
শুরু হয় প্রথম আলো দেখার সাথেই,
তুমি আর আমি একসাথেই ঐ টানে মিলিয়ে যাবো
তবুও শেষ হবে না এই জোয়ারের খেলা—
নতুন উদ্যমে আবার আসবে
তোমার আমার প্রতিনিধি,
নতুন সূর্যে স্নান করে মাছ ধরার
আনন্দ সারা দেহে লেগে থাকবে ওদের;
তাই আমরা নতুন করে ভাবি—
এ পৃথিবীকে বিস্তৃত রহস্যের ভাঙা-গড়ার,
রাতের কালোতে চলে আমাদের
দুর্নিবার মত্ততা,— আলো তো
আসে এরই রেশ ধরে,
এখানে শক্তি আসে তার সজীবতা নিয়ে
নিঃশেষ হয় পরবর্তী বীজের আকারে,
যেখানে শুরু হয় এই আবহাওয়ায়
আলো-জলের চক্রাকারে ঘূর্ণনের গতি —
নতুন ভাবে শুরু হয় পার
ভাঙার শব্দ-উল্টে-পাল্টে আসে
সৃষ্টির উল্লাস, জীবনের শাশ্বত গতি।

একেকটা দিন

শুভাশীষ ভৌমিক
দ্বিতীয় বর্ষ। বাংলা (সান্মানিক)

একেকটা দিন বুকের গভীরে খুব ফাঁকা হয়ে,
পড়ে থাকে, যেন চিঠির উষ্ণতা টুকু নীলকণ্ঠ
পালক বুলিয়ে যায়নি দিনের শরীরে, যেন
ক্লান্ত শিশু ফিরে গেলে অবপন্ন খেলাঘর
পা ছড়িয়ে বুকের মাঁচায়, শূন্য বাতাসের
এলোমেলো আসা যাওয়া আর আমূল
উত্তাপের তেষ্টা নিয়ে;
লোভ শুধু পা মুড়ে বসে থাকে ঘরের মেঝেয়
রক্তে ফিশফিশ মিশে যায় গোপন আকঙ্খায়
শব্দাবালী মজ্জাহীন দিন তোমার মুখের দিকে
উন্মুখ হৃদয় মেলে ধরে অতল উষ্ণতা চেয়ে;
তবু অনিশ্চয় চুপি সাড়ে হাঁটে শিরায় শিরায়
পাঁজরে পাঁজরে প্রহরায় থাকে ভয়, নিঃস্ব দিনে
তোমার সামনে যেতে পায়ে পায়ে দ্বিধা
ফোটে কাঁটার মতন,
কেননা রক্তের গভীরে জেনে গেছি গোটা
জীবনের ইমারতি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে
যাবে যদি তুমিও এমনি ফাঁকা চোখে
তাকাও আমার চোখের দিকে আর আমার
শূণ্যতা একবার মুখ দেখে নেয় তোমার
শূণ্যতায়।

এখনও আমি তৃষ্ণার্ত

শুভদীপ দাস
আশুতোষ কলেজ
Ist Yr, B.A, (Bengali Hons)

মধ্যরাতে চাঁদ নিংড়ে একমুঠো জোৎস্না
আগে মুখে এসে পড়তো—
এখন আকাশ-ই দেখিনা বহুদিন;
তখন কবি ও কবিত্ব সারারাত জেগে
ঘুমাতো জোনাকী .....

এখন রাত্রি মানেই রক্ত
অলস দুপুরে একটা দুষ্টু হাওয়া
বলে যেত তোমার কথা
না লেখা চিঠি —

এখন বাতাস শুধুই শরীর ভেজায়,
ছটফটে কৈশোর, অশান্ত যৌবন
এক এক করে চলে গেল সবাই
চেনা তুলসীতলাও

অনেক ব্যথা কান্নাকত সয়ে
উচ্ছাসী বিকেল, শুদ্ধ সকাল, ধূপে ধোঁয়ায়
বনেদী সন্ধ্যে
তারাও আজ অতীত।

এখনও স্মৃতির সরণীতে দু-পা হাঁটলে
কিছু পুরোনো ভুল মুখোমুখি দাঁড়ায়

এখনও হৃৎপিন্ড ঘুঁড়লে কিছু বেহিসেবী অনিয়ম
জলছবির মতো সেঁটে থাকে মনে
এখনও তোমাকে মনে পড়লে
আমি লক্ষ-প্রদীপ
অমাবশ্যা ভাঙ্গি দু-হাতে।

তুমি

সুরজিৎ বসু
প্রথমবর্ষ (কলা)

বেশ তা হলে মেনেই নিলাম
তোমার জীবন যাপন,
গাছগাছালির মধ্যে আমার
এই যে বৃষ্টি রোপন।
আমি বৃষ্টি দিতে পারি—
শুধু
মেঘে মেঘে উড়িয়ে দিতে পারি,
অ্যাতো দিনের আগলে রাখা
গোপন কথকতা,
যে মেয়েটি মা হবে তার
মস্ত ব্যাকুলতা।

আমার লুকোনো কথার রাশিমালায়
সেই মেয়েটাই,

আমি সকাল বিকেল অপাংক্তেয়
প্রেমিক হয়ে যাই,.....

এ ভুল করোনা কখনো

গৌতম ব্যানার্জী
B.A. IInd yr
Eng Hons.

দুজনে মুখোমুখি সেমিনারের ঘরে বসে,
তুমি হঠাৎ উঠে গেলে কিছু না বলেই;
অবাক হয়ে ভাবলাম—তোমায়
আমি এত ভালোবাসি! অথচ,
তুমি কিছুই নেবে না, কিছুই না!
পৃথিবীতে এত জীবন আছে, এত
মনমরা প্রাণ আছে, আছে ব্যর্থ প্রেম!
তাদের কেন ভালোবাসি না আমি?
মাঝে মাঝে ভাবি, তুমি অনেক দূরের,
যদি পাষাণের বুকে মমতা ঢালতে পারতাম,
যদি শুকনো প্রাণে দিতে পারতাম একটু তাজা আলো,
যদি ব্যর্থ প্রেমের বুকটা জড়িয়ে ধরতে পারতাম
কত ভালোই না লাগত, কত স্বস্তিই না পেতাম!
আমি এক মনহারা জীবন আজ
সারা দেহে আজ শুধু লোড শেডিং
রক্ত মাংস আছে সবই, শুধু
বিদ্যুৎ নেই কোন তারেই,
ব্যাটারিটাও অকেজো হয়ে পড়ে আছে।
চার্জ করার নেই কোন সামর্থ্য।
অগোছালো এক বান্ডিল লক্ষ্যকে বেঁধে
কোনক্রমে এগিয়ে যাচ্ছি ভাঙাচোরা পথে।
লজ্জা হয়, ঘৃণা হয় মাঝে মাঝে,
'আঠারোর' সেই তেজ কোথায়?
এ কোন ট্রাজেডি নয়, ভুল-
মহা ভুল এ জীবনের!

অস্তিত্ব

সুদীপ রঞ্জন বসু,
দ্বিতীয় বর্ষ, অর্থনীতি(সান্ধ্যনিক)

ভাঙাচোরা দেওয়ালে বড় হয়ে ওঠা বটগাছটি
তারপাশে আবার টিভির আন্টেনা,
যেন একে অপরকে পরাস্ত করার মস্ত প্রচেষ্টা।
কিন্তু দিনের পর দিন যায়, বেড়ে
ওঠে গাছটির দেহ, বেড়ে ওঠে শক্তির দম্ভ,
চাপে নুইয়ে পড়ে অ্যান্টেনার রডগুলো,
মরচেও ধরে তাতে, নড়িয়ে দেয় কাকের দলগুলো।
হঠাৎই একদিন প্রচন্ড কালবৈশেখে
দুলে ওঠে তারা, নুইয়ে পড়ে যায়।
শক্তির সেই আস্ফালন পরাস্ত হয় শক্তিমানের
কাছে; রান্নাঘরের চালের ধার দিয়ে পড়ে যায়
উঠানে—বন্ধ করে চলার স্বাভাবিক পথ।
সময় যায়, পরিষ্কার করা হয় পথটি,
সহজ হয়ে ওঠে চলার পথ, হারিয়ে যায়
চোখের সামনে যুযু ধান দুই বিপরীত শক্তির অস্তিত্ব।

প্রয়োজন

অনুজ গাঙ্গুলী

সময়ের ঘড়ির কাঁটাটাকে আটকে দাও,
অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে—
উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে।
এখন সুসময়ের বড়ো প্রয়োজন।
অস্তগামী সূর্যকে বাধা দাও,
অনেক আলো নিভে গেছে—
অর্থময় জ্ঞানের অভাবে।
এখন আলোর বড়ো প্রয়োজন।
ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে থামিয়ে দাও,
অনেক বেশী গরম হয়ে গেছে—
মানবিকতার অভাবে।
এখন শান্তির বড়ো প্রয়োজন।
প্রতিরক্ষার ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দাও,
অনেক মানুষ শেষ হয়ে গেছে—
'ব্যবহার' প্রয়োগের অভাবে।
এখন মানুষের বড়ো প্রয়োজন।
জীবনের সিলেবাসটা পাল্টিয়ে দাও,
জঞ্জালের স্তূপ জমা হয়ে গেছে—
নিজ নিজত্ববোধের অভাবে।
এখন আন্তরিকতার বড়ো প্রয়োজন।

স্বপ্ন সত্যি হবে ?

অরূপ চক্রবর্ত্তী
XII - B (332)

কবে হবে সেই সূর্য্যোদয়
সে ভোরের আলোয় আলোচিত হবে
মনের কালো কোণ।
কোকিল-বউকথাকও ধরবে মিঠে তান
দ্বেষ বঞ্চনা লাঞ্ছনা ভুলে মানব জাতি গাইবে আনন্দ গান।
স্বপ্নের সেই দিন কি শুধুই মনের কল্পনা ?
থাকবে শুধু কবির মাথায় রইবে লেখা
শিল্পীর ক্যানভাস আঁকা।
নাকি তোমার আমার মত শান্তির পতাকা নিয়ে
কাতারে কাতারে মানুষ একদিন সত্যিই নামবে রাস্তা জুড়ে।
"অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল"—
পারেনি সে।
হয়নি তাঁর স্বপ্ন সফল।
কিন্তু আমরা পারবো সেই সুন্দর রোদের
আচ্ছাদন তার গায়ে পরিয়ে দিতে।
শুধু চাই সেই সূর্য্যোদয়
মেঘ কেটে যাবার পর সেই রোদের ঝিলিক।

দিক ভ্রান্ত

আব্দুর রফি
দ্বিতীয় বর্ষ, রাশি বিজ্ঞান

এখন শুধু আকাশ বাতাস খেলা
ঝিলের ধারে নয়শত স্রোত ভান্ডা
কোন গাছটা নয়শত বার দোলে
কোন ডিঙিটার একটু কাছে ডাঙ্গা ॥
কোন পাখিটার ন'শত মাইল গতি
কোন্ যুবতী বৃদ্ধা তবুও সতী
বন্ধু, তুমি কাদের কাদের চেনো ?
সন্ধ্যা, লতা, দেওয়ালী, অদিতি !!
নাম না জানা সুদূর দীপের বুকে
হারিয়ে গিয়েও, এই গলিটা বাকি
এদিক ওদিক সেদিক হল বহু
তোমার হাতেই সূর্য অস্ত নাকি !!

নিখোঁজ

সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য
বি.এ প্রথম বর্ষ

কি খুঁজছো, স্বপ্ন ?
নতুন ভাবে বাঁচবার প্রয়োজনে
না কি মনের কোণে জমে থাকা লোভকে আশ্রয় করে
অন্ধকারে হাতরে বেড়াচ্ছো কিছু রঙিন আশা,
একটু আলো
আর
একজোড়া সজীব চোখের ভালোবাসা।
বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে 'স্বপ্ন'
সে যে হয় না
কাকে এড়াচ্ছো ? নিজেকে ?
না ঐ নোন্‌তা জলে ভেজা দিনগুলোকে ?
সেদিন বাঁধ দেবার জন্য কোথায় ছিলো
তোমার স্বপ্নের অংশীদার ?
'স্বপ্ন' !
সে তো, সেদিনই হারিয়ে গেছে
ফাঁকা মাঠে পড়ে থাকা নোংরা কাগজের ভিড়ে,
সেইমুহূর্ত থেকে
স্বপ্ননামধারী বস্তুটা তো নাম লিখিয়েছে
নিখোঁজদের দলে।
আজ যে শুধু পড়ে আছে
তার ছায়া
যা তোমাকে, তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে
এক পশলা বৃষ্টির খোঁজে।

মোক্ষ

সায়ন আতর্থী
(সাম্মানিক ইতিহাস। - দ্বিতীয় বর্ষ)

তার হাতে আছে বিজয় পতাকা,
মনে নেই আগুন !
আছে দু চোখে শুধুই স্বপ্ন
যদিও সে স্বপ্নের সার্থকতা কোথায়, তাকি সে জানে ?
হয়তো কোন সদর্থক বা নদ্যর্থক উত্তর মেলে,
হয়তো বা সে প্রশ্নের জবাব মেলে কোন অনাগত ভবিষ্যতে
হয়তো বা তার জবাব মুছে যাবে কোন কালস্রোতে।
তার বিজয় পতাকায় আর বিজয় শোভা পায় না,
শোভা পায় আগামী দিনান্তের প্রতিশ্রুতি
যা রচনা করেছে তার আদর্শের মত্ত সৌধ চূড়া
যেন সিজারের সমুন্নত শির।

"দুখের বেশে এসেছ বলে, তোমারে নাহি ডরিব হে"।

রবীন্দ্রনাথের গানে দুঃখ

"অপূর্ণতাই তো দুঃখ, এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রীতম ঘোষাল
একাদশ শ্রেণী

আসমুদ্র ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথকে আনন্দের কবি বলিয়াই জানেন, 'আনন্দরূপমমৃতম' যে স্থলে আনন্দ - অমৃতের বিভাষ, সেইস্থলেই তাঁহার কবিচিত্তের আবেশ। সত্যের আনন্দরূপ ন ধূলিতে লইয়াছে মূরতি, কবি তাহাকেই তাঁহার প্রণতি জানান। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এ কেমন আনন্দ? এ আনন্দ কি ভুবনব্যাপী দুঃখ এবং অমঙ্গলের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া? এড়াইয়া? এ কথা সত্য যে, তাঁহার গীতভাণ্ডারে দুঃখ সম্পর্কিত গান আনন্দের গানের তুলনায় সংখ্যায় কম, কিন্তু গুণের দিক হইতে যে, তাহারাই অগ্রগণ্য, অনুভূতির দিক হইতে একেবারে মৌলিক এবং বিবর্তনশীল। একথা রবীন্দ্রসংগীতানুরাগী মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কেননা আনন্দের তত্ত্ব তিনি পাইয়াছিলেন ঐতিহ্যের হস্ত হইতে, কিন্তু দুঃখের তত্ত্ব, তাঁহার জীবন দিয়া পাওয়া।

আমরা প্রায় অনেকেই জানি যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের বাস্তব জীবনে বহু দুঃখ পাইয়াছিলেন। মৃত্যু একে একে তাঁহার সকল আপনার জনকে লইয়া গিয়াছে। তবু তিনি নিরুদ্বেগ। একদিকে যেমন তিনি বলিয়াছেন—

"কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার, সুখের গ্লানি সয় না যে আর"

যেমন বলিয়াছেন—

"দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক।

মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক॥

অপর দিকে ঠিক সেইরূপ দুঃখে, বিরহে ম্লান হইয়া বলিয়াছেন—

"ও নিঠুর, আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে?
তুমি মর্মে আমায় মারবে হিয়ার কাছে"॥

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, এই বিশ্বকবির মনমধ্যে দুঃখের স্বরূপ কী ছিল? বা তিনি দুঃখকে কী চক্ষে দেখিতেন? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাই, তাঁহারই লিখিত, একটি প্রবন্ধ হইতে।

তিনি লিখিতেছেন—

> "দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয়, সুতরাং তাতে কখনই আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না, সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না - তবে তার পাথেয় কম পড়ে গেল।"

শান্তিনিকেতন / প্রবন্ধ দুঃখ
২৫ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

আবার অপর এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"…..দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব।"

ধর্ম / প্রবন্ধ- দুঃখ
ফাল্গুন - ১৩১৪

দুঃখকে তিনি দুঃখরূপে জ্ঞান করেন নাই। দুঃখের মধ্যেও তিনি আনন্দের মধুরমূরতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাইতো তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

"যস্যাহায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।"

অর্থ: "অমৃত যাঁহার ছায়া, এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন দেবতাকে পূজা করিব?"

তাইতো তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥
.....
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ-
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥"

বলিয়াছেন—

"হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।"
"দুঃখ যদি না পাবে তো, দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?"

যাহাই হউক, রবীন্দ্রজীবনভাষ্যে, দুঃখ, প্রথম পর্যায়ে যেন ঈশ্বরেরই দ্বিতীয় মুখ, পশ্চিমে ফেরানো। তাই তাহাকে চেনা যায় না। দুঃখের হৃদ্য আয়োজনের তলদেশে তাঁহার স্পর্শ আরও ঘনিষ্ঠ, আরও গভীর। এ প্রত্যয় দৃঢ় বলিয়াই কবি গানের পর গানে - আরো গানে - অনেক সময় নৃত্যপর ছন্দে এই আশ্বাসের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

"নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে বাজুক তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে, বেদনা তাহা জানাক্ মোরে—
চাবনা কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে
যেমন করে দাওনা দেখা তোমারে নাহি ডরিব হে॥"

দুঃখের তত্ত্ব এবং সৃষ্টির তত্ত্ব এক, উভয়েই অপূর্ণ। দুঃখের সামগ্রিক অপূর্ণতাই দুঃখের অনিবার্যতার কারণ। দুঃখকে বুঝিতে গিয়া, ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই দর্শনেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন কবি। অপূর্ণতাই দুঃখ, পূর্ণের দিকে আনন্দের দিলে যাইবার পথ তাই এত বন্ধুর। এ যদি লীলাও হয়, তবে তাহাতে মধুরের কোনোও ভূমিকাই নাই।

"নয় এ মধুর খেলা -
তোমায় আমায় সারা জীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা নয় এ মধুর খেলা।
..... ওগো রুদ্র,
দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা
নয়, নয় এ মধুর খেলা॥"

মধুর খেলা তো নয়ই। বরং জীবন এমন এক অভিজ্ঞতা, যাহাতে দুঃখের সাধন পূর্ণ করিলেই ঐহিক স্পর্শ লাভ করা যায়। "চিনিলাম আপনারে আঘাতে-আঘাতে, বেদনায়-বেদনায়, / সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।"

"পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোনখানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে॥

.....

সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথে ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিঁড়ে
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে॥"

এইরূপে বজ্রগর্ভ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আনন্দে উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গীত আমরা আরও শ্রবণ করি—

"সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে
যাক না গো সুখ জ্বলে॥

.....

যেখানে ঘর বাঁধব আমি
আসে আসুক বান
তুমি যদি ভাসাও মোরে
চাইনে পরিত্রাণ।
হার মেনেছি, মিটেছে ভয় - তোমার জয় তো আমারি জয়
ধরা দেব, তোমায় আমি ধরব যে তাই ছলে॥"

দুঃখ পাইয়া, দুঃখের পারে যাওয়া, দুঃখকে জগৎ ব্যাপারের নকসায়, নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সাধ্য ভূমিকায় দেখিতে পাওয়াই কিন্তু সকল দেখা নহে, শেষ দেখাও নহে। ইহার বাহিরেও তাঁহার সৃষ্টির জগতে বিরাজ করিতেছে আরও অনুভব, যাহাদিগকে অত সহজে অন্তরস্থ করা যায় না। যে কবি জগৎকে আনন্দ যজ্ঞের সহিত তুলনা দেন, আপনার জীবনকে সেই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাকেই আবার দেখি, সেই একই জগৎকে 'নরবাস' বলিয়া সনাক্ত করিতে— 'সংশয়', 'সন্তাপ', সুখ, 'তেমন আপন কেহ' না থাকিবার হাহাকার ব্যপ্ত করিয়া রহিয়াছে তাঁহার সমগ্র মানসকে।

কোনো কোনো গানে বাণী দিয়া যাহা ধরা যায় নাই, সুর দিয়া তিনি শুনিয়াছেন সেই সকল দুনিরীক্ষ্য উপলব্ধির ছায়া সরাইয়া চলিয়া গিয়াছেন নির্জন স্বগতভাষনের ধীর খেয়ালি লয়ে, যাহা আমাদিগের স্মরণ করাইয়া দেয়, তাঁহার ছবির 'বোবলা না বোঝায় মেশা' ছায়ালোকের কথা—

"অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে-
কবে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥

এই বেদনার উৎস হিসাবে যদিও কবির 'কামনা' 'বিফল সাধনা',- এই সকলের উল্লেখ করিয়াছেন, তবুও বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, এই বিরহ, এই কামনা, এই সাধনা এক অতল অনন্তকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। এই বেদনা কেবল সর্বজাগতিক নহে, ইহাতে দ্যোতনা রহিয়াছে অতি জাগতিকেরও। তাই চরাচর ব্যাপী তমসার মধ্যে, আলোক পিপাসু মানবের হইয়া তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—

"অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ-
তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণাকণা দান॥
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিণ পাষাণ সম প্রেম সলিল ধারে
সিঞ্চজ শুষ্ক নয়ান॥"

অবিষাদ, কী নিছক্ রোমান্টিক্ ভাবধারার মনে হয়-কোনো কোনো গানে বোধ হয় মহাকবির নিজ রচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি। তাঁহার স্বকীয় বিশ্বাসের সংকট, যাহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে ঐতিহ্য, সংস্কার, শিক্ষার মিলিত ঐক্য তারাকে। তিনি বলিতেছেন একটি একাকিত্বের কথা - আর্তনাদ দিগন্তহীন মহাকাশে হারাইয়া যাইতেছে দিকদিশাহীন পারাবার মধ্যে মানবাত্মা নিরুত্তর। কবি জানেন না, ইহার পরে কী!

"তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোনখানে কোন পাষানের পায়॥
নবীন তরী নতুন চলে, দিইনি পাড়ি অগাধ জলে-
বাহি তারে খেলার ছলে কিনারা-কিনারায়॥
ভেসেছিল স্রোতের ভরে, একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে-
লেগেছিল পালের' পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে, মেঘ ছিল না গগন কোণে-
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সেই আশায়॥"

গ্রীনহাউস এফেক্ট ও আমাদের ভবিষ্যৎ

প্রসেনজিৎ রায় (২য় বর্ষ ভূগোল অর্নাস)

B.Sc (C) — Roll-382

গ্রীণ হাউস এফেক্ট বিষয়টা প্রায় প্রত্যেক সচেতন মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবসময়ই। বহু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা তথা সংগঠনগত প্রচেষ্টার ফলে মানুষ বুঝতে শিখেছেন যে "পরিবেশ দূষণ' রোধ করা দরকার - কারণ ওটা বেশ ক্ষতিকর।" কিন্তু বোঝা আর লড়াইয়ের ময়দানে নামা কখনই এক হতে পারে না। খুব বড় রকমের ক্ষতি না হলে মানুষের টনক নড়ে না। পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য সবচেয়ে দরকারী জিনিসটা হল মানুষের সদিচ্ছা এবং সচেতনতা। সামগ্রিকভাবে এই দুটো জিনিসের চাহিদা পূরণ হওয়া বোধ হয় কোনও দিনই সম্ভব হবে না।

আজ থেকে ১০০ বছর বা তার একটু কম আগে সুইডেনের বিজ্ঞানী Savante Arrhenius সর্বপ্রথম আশঙ্কা বা অনুমান করেছিলেন যে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে অত্যন্ত বিশাল হারে কয়লা ঘালানো হওয়ায় বায়ুমন্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ বাড়ছে এবং ফলতঃ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রাও বাড়তে বাড়তে হয়তো একসময় বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাবে। পৃথিবীর উষ্ণতা সম্পর্কীয় সাম্প্রতিক তথ্যগুলি পর্য্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে সাভ্যানতে অরহেনিয়াস খুব একটা ভুল বলেননি। গত একশ' বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৩°সেঃ থেকে ০.৬° সেঃ পরিমাণ বেড়ে গেছে। গত দশ বছরের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে উষ্ণতম বছরগুলোকে। খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে গড়ে প্রতিবছর পৃথিবীর তাপমাত্রা কমপক্ষে ০.০৩° সেঃ করে বেড়ে যাচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে শিল্পবিপ্লবের আগের উষ্ণতাকে ভিত্তি ধরলে আগামী ২০৩০ সালে সেই সময়ের চেয়ে এক ডিগ্রী বেশি তাপমাত্রা অনুভূত হবে। এই পরিমাণের উর্দ্ধসীমা তিন ডিগ্রী পর্যন্তও উঠে যেতে পারে। ঐ একই ভিত্তিসময়ের হিসাবে ২১০০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা তিন থেকে সাড়ে ছয় ডিগ্রী বেড়ে যাবে। বর্তমান সময়ের ভিত্তিতে, যদি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৫° সেঃ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে আগামী ২০২৫ সালে এই তাপমাত্রা ১° বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ১৬° সেঃ-এ। আগামী শতাব্দীর শেষাশেষি উষ্ণতা এখনকার চেয়ে কম করে তিন ডিগ্রী বেড়ে গিয়ে ১৮° সেঃ-এ পৌঁছবে।

বিজ্ঞজনেরা বলেন মিথ্যা তিনরকম - Lie, Damlie এবং Statistics কিন্তু আমার মতো অল্পবুদ্ধি অর্বাচীনের পক্ষে সদ্য উত্থাপিত সাংখ্যতত্ত্বকে 'থিওরিটিক্যাল' বলে উড়িয়ে দেওয়া মারাত্মক কঠিন। এই উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে সেগুলো মোটেই সুখকর হবে না সেকথা বলাই বাহুল্য। আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যেই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাSea level কুড়ি থেকে ষাট সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে। কারণ বর্ধিত উষ্ণতায় মেরু অঞ্চলের স্থলভাগের উপর যে সুবিশাল পরিমাণ বরফ জমে আছে— তার গলন। তাতে কি মারাত্মক পরিস্থিতি হবে তা আমাদের ধারণার অতীত। উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের সমুদ্রকূলবর্তী বিভিন্ন শহর ও বন্দরের জলমগ্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। টোকিও, সাংহাই, হংকং, ইয়েকোহামা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, চট্টগ্রাম, মাদ্রাজ, কোচিন, কলম্বো, বোম্বাই, করাচি, কেপটাউন, ডারবান, মোম্বাসা, আলেকজান্দ্রিয়া, সাউদাম্পটন,

লিভারপুল, ভেনিস, নু-ইয়র্ক, সানফ্রান্সিস্কো, রিও-ডি-জেনিরো, বুয়েনস্ আয়ার্স, সিডনী, পার্থ, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন— এদের মধ্যে অন্যতম। সবচেয়ে বেশি বিপদ আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলোর। বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ভারতের বিপদের আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশের আঠারো শতাংশ স্থলভাগ চিরতরে লুপ্ত হবে, একশো সত্তর লাখ মানুষ নিহত, আহত, গৃহহীন হবেন এবং অধলটিতে জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বেড়েই চলবে। ভারতের আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবে। সুন্দরবন থাকবে না, হিমালয় থেকে বেরিয়ে আসা নদীগুলোতে জলাভাব দেখা দেবে, গাঙ্গেয় উপত্যকার আবহাওয়া হয়ে উঠবে শুষ্ক ও উত্তপ্ত।

সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক গ্রীনহাউস এফেক্ট। গ্রীনহাউস হচ্ছে একধরণের বিশেষভাবে তৈরী কাচের ঘর, যার মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা যায়। দিনের বেলার সূর্যকিরণে এই ঘরগুলো তীব্র উত্তপ্ত হয়ে পড়ে অতি দ্রুত। যেহেতু কাচেরও তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা আছে, তাই সূর্য ডুবে যাবার পরও দীর্ঘক্ষণ এই ঘরগুলো গরম থাকে। আমাদের পৃথিবীর অবস্থাও অনেকটা এই কাচের ঘরের মত। বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড থাকার জন্য পৃথিবীতে আগত সৌরকিরণ প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ফিরে যেতে বাধা পায়। কার্বনডাইঅক্সাইড পুনঃবিকিরিত (Re-radiated) উত্তাপ শোষন করে নেওয়ার জন্য ভূপৃষ্ঠ ও সংলগ্ন বায়ুস্তরের উষ্ণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এই ঘটনাকেই 'গ্রীণ হাউই এফেক্ট' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমাদের আধুনিক জীবন যাত্রার প্রয়োজনে জৈব জ্বালানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে। ফলে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর জীব মন্ডলের অস্তিত্বকে ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে পৃথিবীর মোট জৈবজ্বালানীর ব্যবহার যদি তিন থেকে চার শতাংশ হারে বাড়তে থাকে, তাহলে ২০০০ সাল নাগাদ বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর পরিমাণ দাঁড়াবে ০.০৩৬৫ শতাংশ থেকে .০৩৮৫ শতাংশের মধ্যে। বর্তমানে এই পরিমাণ ০.০৩৩ শতাংশের একটু বেশী। বাতাসের অন্য উপাদানগুলির মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইডের শতকরা পরিমাণ ০.০৬৫ দাঁড়ালে পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। তাহলে দরকার বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু ভল্ল. নর্ডাস নামে এক বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইডকে নিয়ন্ত্রন করতে যা খরচ হবে, তার পরিমাণ প্রায় ৫৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। সহজেই বোঝা যায়, যে কোন একটি বা দুটি রাষ্ট্রের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয়। যাদের পক্ষে সম্ভব, তারা ও করবে না। কাছেই সম্মিলিত চুক্তির ভিত্তিতে অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। সমস্ত দোষই কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে চলবে না। মিথেন, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন বা CFC, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসও পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়াতে অর্থাৎ গ্রীণহাউস পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর মাথার উপর ওজন স্তর একটি নিরাপদ আবরন। কিন্তু মানুষের হঠকারিতায় সেই আবরন স্থানে স্থানে ছিদ্রযুক্ত হয়ে পড়ছে। রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার শিল্পে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) গ্যাসটি মারাত্মক ভাবে ওজন স্তরকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে। CFC কিন্তু প্রকৃতিতে ছিল না— মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে একে সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে বছরে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টন ওজন ধ্বংসকারী পদার্থ তৈরী হয়, যার ৩৫%-র জন্য আমেরিকা, ৪০%-এর জন্য ইউরোপ দায়ী। জাপান ও রাশিয়ার দায় ১০%। সহজেই বোঝা যাচ্ছে। সচেতনতা না বাড়লে আমাদের ভবিষ্যৎ বিপর্যস্ত। 'নবজাতকের কাছে অঙ্গীকার' করা শুধু মুখেই যথেষ্ট নয়। সক্রিয় পদক্ষেপ অতি দ্রুত না গ্রহণ করলে 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়টি বহু আলোচিত এবং পুরনো, তবুও সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লিখিত হতে পারে।

এক শক্তি সম্পদের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও জ্বালানী সম্পদের অপচয় হ্রাস করা।

দুই জৈবজ্বালানীর পরিবর্তনে সৌর, জল, বায়ু, আনবিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

তিন অরণ্যধ্বংস রোধ করা।

চার জলদূষণ নিয়ন্ত্রন করা।

পাঁচ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের বাস্তবানুগ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মানবসভ্যতা টিঁকে আছে মানুষের শুভবোধের উপর ভিত্তি করে। শুভচেতনার আলোতেই সমস্ত সমস্যার দূরীকরণ সম্ভব হয়-মানুষ হিসাবে একথা সকলকে আন্তরিকভাবে অনুধাবন করতেই হবে।

স্মৃতির সরণী বেয়ে

দেবাশীষ রায়
দ্বাদশ শ্রেণী বিজ্ঞান শাখা, বিভাগ- 'এ'

আজকের দিনটি কর্ণেল চৌধুরির জীবনের এক স্মরণীয় দিন। তিনি আজ এমন এক বিরল সম্মানের অধিকারী হতে যাচ্ছেন যা প্রত্যাশা করে প্রতি সৈনিকই তার সৈনিক জীবন শুরু করে। তাই আজ সংবর্ধনা সভার আয়োজন। কিন্তু আমি কি সত্যি এই সম্মানের যোগ্য ?

২৭শে আগষ্ট, ১৯৯০। হাইকমান্ডের আদেশ মত আমার পোস্টিং এমন এক জায়গায় হল যার অস্তিত্ব আমার অজানা ছিল। সেদিন পর্য্যন্ত আমি জানতাম না যে এই যোগদানের স্মৃতি চিরকাল আমার মনকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। আমাদের টেন্ট ফেলা হল এক নির্জন মাঠে। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল আমার প্রিয় মাউথঅর্গান। কদিন ধরেই লক্ষ্য করছি এই নির্জন দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন মাঠেও একটি ছোট্ট মেয়ে রোজ আসে আমার মাউথঅর্গান শুনতে। কিন্তু কাছে ডাকলেই দূরে ছুটে পালিয়ে যায়। এরই মধ্যে একদিন আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ঘুম ঘরের মধ্যেই একদিন দেখলাম সেই মেয়েটি দরজার ফাঁক দিয়ে আমায় দেখছে। রোজকার মত আজও তাকে ডাকলাম। আজ কিন্তু সে আমার কাছে এল। আমার বিছানার পাশে এক গোছা ফুল রেখে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ভীষণ ভালো লাগল আমার সেই মেয়েটিকে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। আমার নির্দেশেই আমার বাহিনীর জোয়ানরা যুদ্ধক্ষেত্রের নানা দিক দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু করেছে। বেশ কিছুদিন আমরা এক সুবিধাজনক অবস্থায় রইলাম। কিন্তু আমাদের এই অবস্থা অচিরেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হল। একদিন রাত্রে সবে যুদ্ধের মূল্যবান কাগজপত্র দেখে শুতে যাব, এমন সময়ে দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ।

"কি ব্যাপার" ?

'স্যার শত্রুরা আমাদের চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনো উপায় নেই'।

'কক্কনো না। প্রাণ থাকতে আত্মসমর্পণ নয়। যে যেভাবে পারো আত্মরক্ষা কর। কিন্তু আত্মসমর্পণ একদম নয়।

আমি আমার রিভলবার নিয়ে প্রস্তুত হলাম। শুরু হল এক মরণপণ সংগ্রাম। হঠাৎ একটা গুলি আমার পায়ে লাগল। নিজের শেষ শক্তি টুকু দিয়ে আমি লড়তে লাগলাম। শত্রুর সঙ্গে আর না পেরে উঠে আমি দিকবিদিক জ্ঞান শূণ্য হয়ে আমি দৌড়তে লাগলাম। জখম পায়ে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল।

চোখ যখন খুললাম সামনে সেই মেয়েটির মুখ দেখে অত্যন্ত অবাক হলাম। অদূরে দাঁড়িয়ে তার বাবা আমাকে জানাল সকালে সে তার বাগিচায় আমাকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার কাছেই জানলাম তার নাম আলি আর সেই মেয়েটি তার বেটি— রুখসার। আলির বাড়িতে আমার যত্নের কোন ত্রুটি হত না। রোজ রুখসার আসত আমায় দেখতে। বেশ খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর একদিন আমি তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করি। ক্ষণিকের মধ্যে তার চোখ দুটি জলে ভরে যায়। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে আমি আলিকে জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম রুখসার বাকশক্তিহীন। আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম — ভগবান সত্যি কত নিষ্ঠুর। এই ফুলের মত মেয়েটিকে তিনি তার মা থেকে বিচ্যুত ত করেছেনই, তার সাথে তাকে পূর্ণতাও দেন নি।

আলি রোজ এসে আমাকে বাইরের খবরাখবর দিত। কিন্তু সত্যিই কি সে বিশ্বাসযোগ্য ? তাহলে রোজ রাত্তিরে আলো নিয়ে চুপিচুপি সে কোথায় যায় ? কেন আমি খেতে চাইলেও আমাকে খেতে দেয় না ? না, আলিকে এবার একটু নজরে রাখতে হবে।

পরের দিনই রাত্রিবেলা হঠাৎ ভীত, সন্ত্রস্ত আলি আমার ঘরে এসে জানাল, "বাবু দুশমন টের পেয়ে গেছে আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন। আমার বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। বাবু আমায় বাঁচান। ওরা আমাকে জানে মেরে ফেলবে। আমি ছাড়া রুখসারের আর কেউ নেই বাবু। আমি চলে গেলে ওকে দেখভাল করার কেউ থাকবে না।"

"কিন্তু আলি আমি যদি বলি তুমি ওদের খবর দিয়েছ ?"

"বাবু আপনি একি বলছেন ? আমি আপনাকে দুশমনদের হাতে তুলে দেব ? এতো বেইমানি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।"

"আলি বাজে কথা বলার সময় এটা নয়। তোমার বাড়ির পেছনের দরজাটা খোল।"

"বাবু আমাকে বাঁচান। ওরা আমাকে খতম করে ফেলবে।"

"আলি তুমি যদি দরজাটা না খোল তুমি আমার গুলিতেই মরবে।"

পেছনের দরজা দিয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। পিছনে পড়ে রইল আলি আর তাকে ঘিরে শত্রুরা। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ। শুনে পেছনে তাকালাম। আলির নিশ্চল, রক্তাক্ত দেহটা পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলাম। ফাঁকা মাঠে দূর থেকে দৌড়ে এল রুখসার। আমার দিকে এক অদ্ভুত চোখে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে কি ছিল?— ক্ষোভ, হতাশা না কি বেদনা? আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। আলির শেষ কথাগুলো মনে পড়ল— "বাবু রোজ রাত্তিরে আমি আলো নিয়ে চারিদিকে দেখতে যেতাম কেউ আপনার এখানে থাকার কথা টের পেয়েছে কিনা। আর আপনি আমায় বেইমান বলছেন। ---------- বাবু আমি চলে গেলে রুখসারও মারা যাবে----------"

আর ভাবতে পারলাম না। জোরে রুখসারকে ডাকলাম। ক্ষণিকের জন্যে সে আমার দিকে তাকিয়ে দূরে মাঠে দৌড়ে পালিয়ে গেল। রাত্রির ঘন অন্ধকারে মিশে গেল সেই ছোট্ট মেয়েটি— রুখসার।

সেই কর্নেল চৌধুরি আজ সংবর্ধিত হতে চলেছে। আচ্ছা, আজও কি তার মনে পড়ে না রুখসারের সেই শূণ্য দৃষ্টির কথা? সেই ম্লান দৃষ্টি যা তাকে বলতে চেয়েছিল — তার আব্বার মৃত্যুর কি কোন দরকার ছিল? কে তার এই করুণ পরিণতির জন্য দায়ী? আজও কি কর্নেল চৌধুরি মুছে ফেলতে পেরেছে আলির মৃত্যুর দিনটির কথা? আজও কি সে উত্তর পায়নি প্রকৃত "বেইমান" কে ছিল?

ধীর পদক্ষেপে কর্নেল চৌধুরি উঠে গেলেন পুরস্কার নিতে। করতালিতে মুখর সভার মাঝে পুরস্কার হাতে তার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

জীবনমুখী গান : বাংলা গানের নতুন দিগন্ত, নাকি অন্তিম ধাপ!

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথমবর্ষ (ভূগোল)

আজকাল আধুনিক বাংলা গানের ক্যাসেটে একটা কথা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। সেটা হলো "জীবনমুখী বাংলা গান"। গানের এরকম নামকরণ এবং গানের বিষয়বস্তুর সাথে "জীবনমুখী" শব্দটির তুলনা করলে বোঝা যায় যে জীবনের নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিকগুলিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছে এই "জীবনমুখী" গান। যদিও সাঙ্গিতীক পরিভাষায় এগুলি একরকমের 'আধুনিক গান' ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে 'আধুনিক গান' শীর্ষক পরিহার করে "জীবনমুখী" করার উদ্দেশ্য বা সুবিধাটা কী?

আসলে আধুনিক বাংলাগানের সেই স্বর্ণযুগ আজ আর নেই। সেই তালাত মামুদ, সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী, কমল দাসগুপ্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বা মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত গায়কও যেমন এখন নেই তেমনই নেই রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুবীন দাশগুপ্ত কিম্বা প্রণব বোসের মত সুরকার বা গীতিকার। তাই আজ যে সব বাংলা আধুনিক গান হচ্ছে সেগুলি কথা, সুর ও গায়কী এই তিনেরই অভাবে অপুষ্টি জনিত রোগে আক্রান্ত। কিছু কিছু যে ভাল গান বেরোচ্ছে না তা নয় তবে তার সংখ্যা সীমিত।

এমত পরিস্থিতিতে বছর তিনেক আগে এই জীবনমুখী গানের "প্রাদুর্ভাব" দেখা দিল। প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সুমন, নচিকেতা, অঞ্জন দত্ত, মানসী ভৌমিক, পল্লব কীর্তনিয়া প্রমুখ আধুনিক শিল্পীদের হাত ধরে জীবনমুখী গানের আবির্ভাব। গানের শীর্ষক-এ "জীবনমুখী" লেখার সাথে সাথে সাধারণ মানুষ একটু বিস্মিত হলো। তারা ভাবলো এ বোধহয় কোন নতুন ধরণের বাংলা গান হবে। আর বাঙালী তো চিরকালই হুজুগে। ফলে হট-কেকের মতো এই নতুন ধরণের ক্যাসেট বিক্রী হতে লাগলো। সুরের বৈচিত্র্য, মানুষের মনের কথা, সুরে পাশ্চাত্য র‍্যাপ ও অন্যান্য মিশ্রণ এবং মাটির পেলবতা গানগুলিকে দিল মানুষের হৃদয় হরণের এক অবিস্মরণীয় ক্ষমতা গানগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে লক্ষ্য করা গেল যে শিল্পী নিজেই গানের রচয়িতা, গানের সুরকার এবং সর্ব্বোপরি গায়ক। বাংলা গানের স্থবির ভাণ্ডার যে এর মাধ্যমে জঙ্গমতা পেল তা বোঝা গেল ক্যাসেট বিক্রীর হার ও ঐসব শিল্পীদের programme- এ উপস্থিতির হার দেখে। কিন্তু শুরুতেই যে ঘাটতি লক্ষ্য করা গেল তা হলো সাধারণের মনের কাছে পৌঁছাতে গিয়ে এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যাকে আক্ষরিক অর্থে অশ্লীল ও অসভ্য বললে বোধহয় কটূক্তি হয় না। তাই মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবার ও উচ্চবিত্তরা প্রথম চোটেই গানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। গানের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো কিছু উঠতি যুবকদের মধ্যে।

আগেই বলেছি আগেকার সুরকারদের মতো সুর বা গীতিকারদের মত কথা দেবার ক্ষমতা আধুনিক সুরকার ও গীতিকারদের নেই। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের 'ফিড ব্যাক' ও অন্যান্য পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের অনুকরণ চলতে লাগলো যথেচ্ছভাবে। এবং আরো একঘেয়ে হয়ে এলো গানগুলো যখন দেখা গেল গানে সুরের বৈচিত্র্য কমে আসছে। ফলে দেখা গেল প্রথম বছরে গানে যে জনপ্রিয়তার জোয়ার ও যে পরিমাণ গান সৃষ্টি হয়েছিল তা কমে বর্তমানে ক্রমশঃ তলানিতে এসে ঠেকলো। জীবনমুখী গান বাংলাগানের জগতে নতুন দিগন্তের সূচনা করেও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ডুবে গেল। শিল্পীদের তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ তাদের আখের গোছানো হয়ে গেছে।

বর্তমানে বাংলা আধুনিক গান বা জীবনমুখী গান ঠিক এরকম এক পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ অবস্থা চলতে দিলে ক্ষতি বাংলা গানের, বাংলা গানের শ্রোতাদের। এখনকার শিল্পীদেরই দায়িত্ব সেই ভাটার টান থেকে মুক্ত করে বাংলা গানকে জোয়ারের পথে চালিত করা। আর এজন্য দরকার পারস্পরিক সৌহার্দ্য। নিজেদের সীমিত গন্ডী পেরিয়ে একে অপরের জন্য সুর দিতে হবে, লিখতে হবে গান। যেমনটি এবার পূজায় হৈমন্তী শুক্লার একটি ক্যাসেটে হয়েছে যাতে সুর দিয়েছেন সুমন চট্টোপাধ্যায়। অবিকল পাশ্চাত্য অনুকরণের পথ পরিহার করে বাংলা গানের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পাথেয় করে সুরকারদের সহজাত ও সৃজনশীল সুর সৃষ্টি এবং গীতিকারদের মার্জিত রুচিসম্পন্ন গীতরচনার মধ্য দিয়ে এই জীবনমুখী গানই হয়তো বাংলা গানকে নতুন পথ দেখাবে।

সেই চোখ

শান্তনু চক্রবর্ত্তী
(বি. এস সি)

ক্যাকাশে জিনসের প্যান্টের উপর ইস্ত্রি করা জামাটা চাপিয়ে, আয়নার সামনে গিয়ে স্বরূপ চিরুনি দিয়ে চুলচাষ শুরু করে দিল। পাক্কা একঘন্টা ধরে ড্রেসট্রেস করার পর মাকে আর ঠাকুরকে প্রণাম করে ফাইলটা নিয়ে কলেজের দিকে রওনা দিল। যদিও ফাইল নেওয়াটা লোকদেখানো মাত্র। আসলে আজ স্মৃতির সাথে সত্যজিতের 'চারুলতা' দেখার প্রোগ্রাম আছে। অনেক কষ্টে ওকে রাজি করানো গেছে। মনে মনে স্বরূপ ঠিক করেনিল যে ভাবেই হোক আজ ও ওর ভালবাসার কথা স্মৃতিকে জানাবে। এর আগেও বহুবার স্মৃতিকে বলতে চেয়েছে যে "স্মৃতি আমি তোমায় ভালবাসি"। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। প্রতি বারই যেন কোন এক অজানা শক্তি ওর ঠোঁট ভারি করে দিয়েছে। ওর আশা আকাঙ্খাগুলো বুকের মধ্যে বদ্ধ থেকে ওকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে চলেছে। রাতের ঘুম, খাওয়া সবেতেই একটা অজ্ঞাত অনিচ্ছা দেখা দিয়েছে।

কলেজে পৌঁছে স্মৃতিকে ক্যান্টিন থেকে নিয়ে মেট্রোয় চেপে সোজা রবীন্দ্রসদনে চলে গেল। সেখান থেকে হেঁটে নন্দনে পৌঁছাল, 'নুন-শো'তে ওদের মত কলেজকাটা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। তবে ওরা ব্যালকনীর যে দিকটায় বসে ছিল সেদিকটা প্রায় ফাঁকাই ছিল। "আমি চিনিগো চিনি তোমারে ওগো বিদেশীনি"— এই গানটা শেষ হতেই স্বরূপ ডানহাতে স্মৃতির বাঁ হাতটা চেপে ধরল। স্মৃতি জোর করে ছাড়িয়ে নিল। বিরক্ত হয়ে বলল — এসব কি হচ্ছে স্বরূপ। একি অসভ্যতা!

স্বরূপ:- স্মৃতি তোমাকে একটা কথা বহুবার বলতে চেয়েছি, কিন্তু কোনবারই বলতে পারিনি। আজ আমাকে বাঁধা দিও না প্লিজ, প্লিজ স্মৃতি আমায় বলতে দাও।

স্মৃতি:- 3:2 তোমার এই কথা গুলো সিনেমার পরে বললে চলবে না। যত সব ঝামেলা। নাও নাও, যা বলার সংক্ষেপে বলে ফেল।

স্বরূপ:- (প্রায় ঝড়ের গতিতে বলে যেতে লাগল) স্মৃতি তোমায় আমি ভালোবাসি স্মৃতি। হ্যাঁ স্মৃতি তোমায় আমি খুব ভালবাসি তুমিও আমাকে ভালবাস স্মৃতি। স্মৃতি আমাকে ভালবাসতেই হবে স্মৃতি প্লিজ। স্মৃতি আমায় ভালোবাস। ঘৃণায় রাগে স্মৃতির চোখমুখ লাল হয়ে উঠল সিট থেকে উঠে স্বরূপের গালে একটা বাঁ হাতে একটা চড় সজোরে কষিয়ে দিল।

স্মৃতি:- তোমাকে ভালবাসব আমি? তোমার মত ভিক্ষারিকে? যার না আছে গাড়ি, না আছে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, তোমাকে বন্ধু করাই আমার ভুল হয়েছে। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। দুর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। এছাড়া আমি সৌভিককেই ভালবাসি। কিন্তু স্বরূপ যেন শিশুর মতো নাছোড়বান্দা।

স্বরূপ:- না না স্মৃতি তুমি আমাকে ঘৃণা করো না, তুমি আমাকে ভালবাস প্লিজ। তুমি সৌভিককে ভালবেসোনা প্লিজ আমায় ভালোবাস স্মৃতি।

স্মৃতি:- আমি সৌভিককেই ভালোবাসি বিয়ে করলে ওকেই করব। তোমার মত ফালতুরা আমার ঘরে চাকরের মত থাকে।

স্বরূপ :- (হঠাৎ রেগে গেল) না। স্মৃতি, তুমি সৌভিককে ভালবাসবে না। তুমি শুধু আমাকে ভালবাসবে। না হলে সৌভিককে আমি এভাবে গলাটিপে মেরে ফেলব।

স্মৃতি :- একি আমার গলা টিপছ কেন অসভ্য, জানোয়ার ? আঃ আঃ ছাড়, লাগছে। কে আছ বাঁচাও আমায়.....। স্মৃতির আর্তচিৎকারে হলের দর্শকেরা উঠে এসে স্বরূপকে মেঝেয় ফেলে পিটতে লাগল। আর স্মৃতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা লুটতে লাগল। সকলে চলে গেলে স্মৃতি ওর জুতোর হিল দিয়ে ওর ডান হাতটা মারিয়ে দিয়ে চলে গেল। সেই যে স্মৃতি চলে গেল তার পর থেকে আর কোনো দিন স্বরূপের দিকে ফিরেও তাকায় নি। এরপর ওর সাথে সৌভিকের ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে যেতে লাগল। ওদের বিয়ের কার্ড পাওয়ার পর স্বরূপ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কান্নার খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ড্রাগের ধোঁয়ায় জীবনকে ধোঁয়াশায় পরিণত করতে লাগল। সেদিন স্বরূপ স্মৃতি কে নিয়ে লেখা ওর স্বরচিত কবিতার ডায়রির পাতাগুলো ছিঁড়ে দিল। এমন সময় বিজয় দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ওর পায়ের কাছে ধপাস করে বসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল — স্বরূপদা একটা খারাপ খবর আছে।

স্বরূপ :- হ্যাঁ, জানি আমার জন্য ভালো খবর থাকে না। খবরটা কি তাড়াতাড়ি বলে ফেল। আমাকে আবার পুড়িয়া আনতে যেতে হবে।

বিজয় :- হ্যাঁ বলছি। দুপুরে সৌভিকদা দেওয়ালে ফটো লাগানোর সময় জানালার কাঁচে পড়ে গিয়ে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। নার্সিং হোমে ভর্তি আছে। ডাক্তার বলেছেন এখুনি দুটো চোখের যোগাড় করতে। নাহলে ও চিরদিনই অন্ধ হয়েই থাকবে। আমি যাই স্মৃতিদিকে খবরটা দি গে আর তোমাকেও বলি স্বরূপদা ঐ সর্বনাশা নেশাটা ছাড়।

স্বরূপ :- বাঃ ! বাঃ ! এত এক মস্ত সুযোগ। এসুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না। এবার আমি জিতবই। এবার আমাকে কেউ রুখতে পারবে না।

বিজয় :- একি স্বরূপদা, তুমি মানুষ না পশু ! সৌভিকদার কষ্টে আনন্দ করছ !

স্বরূপ :- নারে বিজয়, ও তুই বুঝবিনা। আচ্ছা আমার মাথার দিব্যি খেয়ে বল আমি যা বলব তাই করবি।

বিজয় :- খামোখা দিব্যি টিব্যি খেতে যাব কেন ?

স্বরূপ :- প্লিজ ভাই আমার কথা রাখ। যা বলছি করনা, এই আমি তোর পায়ে ধরছি।

বিজয় :- আহা, ছাড় ছাড় করকি। তবে একটা শর্ত আছে। তুমি যদি ড্রাগ ছেড়ে দাও তবে তুমি যা বলবে তাই করব।

স্বরূপ :- ছেড়ে দেব কিরে। ড্রাগই আমার থেকে দূরে সরে যাবে। শোন, তুই স্মৃতিকে সৌভিকের চোখ নষ্ট হওয়ার খবরটা দিবি না। তুই ছাড়া আর কেউ জানে নাতো ব্যাপারটা ?

বিজয় :- না। আমি আর ওর বাবাই শুধু এটা জানি। কারণ দুপুরেই ঘটনাটা ঘটেছে। তখন টিভির ক্রিকেটে সবাই মত্ত ছিল। তবে স্বরূপদা সত্যকে কখনো চাপা যায় না, পরে একদিন স্মৃতিদি জানবেই। তখন কিন্তু আমি দোষী থাকবো না।

বিজয় চলে যেতেই স্বরূপ রাস্তায় বেরিয়ে ..... গেল।

সৌভিক সেরে উঠলে ওর সাথে স্মৃতির বিয়ে হয়ে গেল। পরের সপ্তাহেই হনিমুনে ওরা দীঘায় চলে গেল। পৌঁছানোর পরদিন সমুদ্র সৈকতে বসে ওরা দুজনে সূর্যাস্ত দেখছিল। এমন সময় সৌভিক স্বরূপের কথা তুলতেই স্মৃতি খুব রেগে গিয়ে বলল — দিলে তো আমেজ নষ্ট করে, যতসব ফালতু লোকের কথা বলে।

সৌভিক :- হ্যাঁ, ওতো আজ ফালতু হবেই। কারণ ওযে তোমার ভালোবাসাকে বাঁচানোর অপরাধ করেছে। তোমার প্রেমকে সজীব রাখার পাপ করেছে। তার শাস্তি তো ওকে দিতেই হবে এসব কদর্য কথা বলে।

স্মৃতি :- একি ! তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ? এছাড়া ওরমত একটা নেশাখোর যে কিনা নেশার অভাবে আত্মহত্যা করে সে আবার আমার প্রেমকে বাঁচাবে কি গো ? এসব কি উল্টোপাল্টা বলছ ?

সৌভিক : উল্টোপাল্টা নয়, ঠিকই বলছি। আজ ওর জন্য তোমার সিঁথি লাল সিঁদুরে চক্‌চক্ করছে। ওর জন্যই আজ তোমার ভালবাসা পরিণতি পেয়েছে। আর আমার যে চোখে তুমি তোমার ভালবাসার প্রতিচ্ছবি দেখছ সেটা আমার নয় তোমার ঘৃণ্য বন্ধু স্বরূপের। ভালবাসার এই ত্যাগের মাধ্যমে ও আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে।

স্মৃতি :- কি বলছ তুমি ? এযে অবিশ্বাস্য, এ হতেই পারে না।

সৌভিক :- ঠিকই বলছি। একটা এক্সিডেন্টে বিয়ের আগেই আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ও ওর চোখ দিয়ে আমার নতুন

জীবন দিয়েছে। ফিরিয়ে দিয়েছে তোমার ভালবাসা। ড্রাগের নেশায় নয়, শুধু একটু প্রেমের আশায় ও আত্মহত্যা করেছে। আর তুমি ওকে শতঘৃণা করলেও ওর চোখকে আমার মাধ্যমে ভাল না বেসে পারনি। হঠাৎ যেন সৌভিকের কণ্ঠস্বর পাল্টে স্বরূপের হয়ে গেল। বারবার ঐ কণ্ঠস্বর তোতা পাখীর মত 'আমায় ভালবাস' বলেই যেতে লাগল। ভয়ে আতঙ্কে স্মৃতি সমুদ্রের দিকে ছুটতে লাগল। সৌভিকের ঘোর কাটল সমুদ্রের নোনতা জলে। চোখ খুলতেই ওর কাছে সব ঝাপসা হতে লাগল। স্মৃতি দূরে আরো দূরে যেতে যেতে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আর কিছু দেখতে পারছে না, চারিদিকে ঘন অন্ধকার ছেয়ে আসছে। তবে কি স্মৃতিকে তার ভালবাসার ত্যাগের কথা শোনাতেই কি স্বরূপের চোখ এতক্ষণ জীবন্ত ছিল? নাকি সৌভিকের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন?

অবিনশ্বর

নজরুল ইসলাম
বি.এসসি প্রথম বর্ষ ক্রমিক সংখ্যা-২২১
সাম্মানিক ভূগোল

শরতের প্রভাত। নদীতীরে পথ হাঁটছি। শরতের শান্ত নদী। শিউলির গন্ধে, নবীন ধান্যর দোলায় দোলায়িত বাতাস। শিশির স্নাত পথঘাট। প্রভাতের রক্তাভ অরুণ উঁকি মারছে পূবে। অস্পষ্ট সে আলোক। কুয়াশার চাদর কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে সমস্ত চরাচরকে। কুলুকুলু ধ্বনিতে বয়ে চলেছে নদীটি। তার উপর ভাসছে কয়েকখানি ক্ষুদ্র ডিঙি। মন উদাসী করা নির্মল প্রভাত। নদীর ওপারের গাছপালাগুলি যেন পটে আঁকা ছবি। অজ্ঞাত কোন শিল্পী অত্যন্ত নিপুণ হাতে, অতীব যত্ন সহকারে এঁকেছে সে ছবি। আকাশে রাশি রাশি পেঁজা তুলার মত শুভ্র মেঘের পার্নাস। সব মিলে সে একাকার কাণ্ড। আমি মৃদুতালে পথ ছলছি। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি ছেলে ও মেয়েকে। ওরা পাশাপাশি হাঁটছে। লক্ষ্য করি নি পিছন থেকে এসেছে বলে। কাছে এলে চিনতে পেলাম — আমাদেরই গাঁযের মেহবুব ও ফুলমতি। কথা বললাম। ওরা চলে গেল। ক্রমশঃ হাঁটতে হাঁটতে ওরা দৃষ্টির গোচর থেকে লীন হয়ে গেল। এহেন নির্মল উষায় অত্যন্ত সাদামাটা, সরল, জীবন্ত এদেরকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রৌদ্রের তেজ বাড়ছে। বাড়ি ফিরে এলাম।

বছর পাঁচেক পর। আজও পথ হাঁটছি। পড়ন্ত বিকেলের সোনালী রোদ্দুর যখন হলদেটে হয়ে নদীজলকে রক্তরাগে রঞ্জিত করে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত, এমনি সে সময়। অন্যমনস্ক হয়েছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন ডাকছে। তাকালাম, একটি মেয়ে। অবাক হয়ে গেলাম। চিনতে পেলাম অবশেষে। এ সেই ফুলমতি। আজ সে একা। তার চেহারা, স্বাস্থ্য দেখে মনে হয় না, এ সেদিনের সেই ফুলমতি, সেই কলহাস্যা, চটুল ফুলমতি। জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার ফুলমতি, এ কী চেহারা হয়েছে তোর; যেন জৈষ্ঠের পোড়াকাঠ। বললাম বস্। ইতস্ততঃ করছিল। আমি টেনে পাশে বসালাম। জিজ্ঞেস করছিলাম — ওর কথা, মেহেবুবের কথা। মেহেবুব প্রসঙ্গ উঠতেই দুনয়ন জলে ভরে এল — আধা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও অনুভব করলাম। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে সে বলতে শুরু করল তার ব্যথিত কাহিনী। ফুলমতির জবানীতেই শোনা যাক সে কাহিনী।

'মেহেবুব ও আমার মধ্যে কোন সম্পর্ক এখন নেই'। ওকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। বললাম, মানে?

—'মানে আমাদের মধ্যে 'তালাক' হয়ে গেছে। থমকে গেলাম, চমকে উঠলাম আমি। অ্যাপাত ছোট, অথচ নির্মম, নিষ্ঠুর, কঠোর 'তালাক' শব্দটি শুনে তাজব বনে গেলাম। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

'বিশ্বাস হচ্ছে না—না?'—টেনে টেনে ব্যথিত সুরে বলছে সে, 'তবে শোন'।

প্রাক্‌বিবাহ দিনগুলি কেমন ছিল, সে সুখস্মৃতি রোমন্থনে কাজ নেই। আমরা বিবাহ করলাম। বয়ে চলছিল আমাদের সংসার সমুদ্রের শান্ত স্রোত। শান্ত সমুদ্রেও অবশেষে ওঠে ঢেউ, ওঠে ঝড়; ভুলে যায় তার নিশ্চিন্ত শান্ততার কথা। মাহফুজা নাম্নী একটি মেয়ে আমাদের সংসারে দোলা লাগিয়ে দিল; অশান্তির মেঘ জমতে শুরু করল আকাশে — ক্রমে ক্রমে তা আরও গাঢ় হতে লাগল — আমাদের মধুর সম্পর্কে চিড় ধরল। সত্যি বলতে মেহেবুব আর আমাকে সহ্য করতে পারত না, সর্বদা গালমন্দ ছাড়া কথা বলত না। অনেক বুঝিয়েছি মেহেবুবকে, অভিমান করেছি, কিন্তু ফলং নাস্তি; পাষাণ হৃদয় গলে নি তবুও। এত কিছু সত্ত্বেও শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সহ্য করে টিকে ছিলাম। কিন্তু বিধাতা এতেও বাধ সাধল। হয়ত আমার চূড়ান্ত সর্বনাশ দেখার জন্য চুপটি মেরে বসেছিলেন অন্তরালে। আর তাই হয়তো একদিন মাহফুজা উধাও হয়ে গেল কোথায়। মেহেবুব মদে চুর হয়ে ঢুকল ঘরে। এবার শুরু হল আমার চূড়ান্ত দুর্দিন। সর্বদা শারীরিক উৎপীড়ন, মার,

খিস্তি চলতে লাগল। তার অফিসে যাওয়া লাটে উঠেছে অনেকদিন। ছোট একটি অফিসে সে চাকুরী করত। তার ধারণা আমার জন্যই মাহফুজা চলে গেছে। অথচ আমি মাহফুজাকে একদা বোঝাতে গিয়ে অপমানিত হয়ে পরে আর কিছু বলি নি। পিটিয়ে, খিস্তিতে আমার জীবন যখন দুর্বিষহ, তখন বাবা আমার সইতে না পেরে, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে, স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ডিভোর্স করালেন। মেহেবুবও তাই চাইছিল। আর তারপরে এইত অবস্থা।

এই পর্য্যন্ত বলে হুহু করে কাঁদতে লাগল ফুলমতি। কাঁদুক সে সমস্ত হৃদয় উজার করে, বাধা দিলাম না। ইতিমধ্যে সুগোল চন্দ্রিমা আকাশে উঠে গেছে। চারিদিকে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে। নদী চরের অজস্র বালুকারাশি চিকচিক করছে জ্যোৎস্নার আলোয় প্রতিফলিত হয়ে। মনটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই খারাপ হয়ে গেল। ফুলমতি চলে গেল। আমিও বাড়ির জন্য পা বাড়ালাম।

এরপরে কাজের চাপে ছিটকে গেছি দূরে। বয়ে গেছে বহু জল, কেটে গেছে অনেক বসন্ত। খোঁজ নিতে পারি নি মেহেবুব— ফুলমতির। ফিরেছি এবার গাঁয়ে। অনেক পরিচিত বন্ধু—বান্ধব, পাড়া—পড়শীদের সঙ্গে কথা হচ্ছে নূতন করে। কথা প্রসঙ্গেই কানে এল মেহেবুব মুমূর্ষু। নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আজ সে আক্রান্ত। কী হয়েছে, একদিন বিকালের দিকে দেখতে গেলাম তাকে।

শীর্ণ, কঙ্কালসার মেহেবুব শুয়ে আছে; পাশে বসে তার ডিভোর্সী পত্নী ফুলমতি ও তার ছেলে। অবাক হওয়ার পালা আমার। কিন্তু যা শুনলাম তার থেকে আরও কম আশ্চর্য হলাম না। পরে ভেবেছি, এও সম্ভব। অসংযমী জীবন যাপনের ফলে ক্যান্সার রোগগ্রস্ত, সকলের পরিত্যক্ত মেহেবুব এখন তার প্রাক্তন পত্নী ফুলমতির জিম্মায়। আর ফুলমতি নিঃস্বার্থভাবে, অক্লান্তভাবে মেহেবুব-এর সেবা করেই যাচ্ছে বাকী কটা দিনের জন্য। মেহেবুব বাক্‌রুদ্ধ এখন। ফুলমতিকে দুটো সস্তা সান্ত্বনার বাণী না শুনিয়ে কথা বলে চলে এলাম। ফুলমতি তার ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। ব্যথিত হৃদয়ে অথচ মুগ্ধ আমি বাইরে বের হয়ে দেখি সায়াহ্নের ম্লানালোক সমস্ত দিনের উপর যবনিকা ফেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

সেকালের ও একালের নিরুপমা

মৌ রায় বি. এ (প্রথম বর্ষ) (সাম্মানিক বাংলা)

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নিরুপমা" কে অনুসরণ করেই এই গল্পের রচনা।

অঞ্জলি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তার বাবা একটি কারখানায় কাজ করেন। তিনি তার ক্ষমতানুযায়ী মেয়েকে মানুষ করেছেন। অঞ্জলির বয়স যখন কুড়ি তখন তার বাবা ও মার দুজনেরই একই চিন্তা মেয়ের বিয়ে নিয়ে। যখনই বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠে, অঞ্জলি বলে "বাবা আমি বিয়ে করব না, আমি এখন একজন প্রকৃত মানুষ হতে চাই" কিন্তু অঞ্জলি পারে না, সে তার বড় হওয়ার স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে মা-বাবার পছন্দ অনুযায়ী পাত্রকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় এবং এর সাথে সে তার ভালবাসাকে হারিয়ে ফেলে। অঞ্জলি অনিন্দ্যকে ভালবাসত। তাদের প্রথম আলাপ হয় কলেজে। অঞ্জলির কাছে অনিন্দ্য সাধারণের মধ্যে অসাধারণ।

অঞ্জলির বিয়ে হয় উচ্চশ্রেণীর এক পরিবারে, যেখানে সম্পর্কের লেনদেন হয় অর্থের মাধ্যমে, কিন্তু অঞ্জলির বাবা রামপ্রসাদ সেই সম্পর্কের দেনা অর্থাৎ ধার শোধ করতে ব্যর্থ হন। ব্যর্থতার জ্বালা অঞ্জলিকে প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হয়। একদিন হঠাৎই অঞ্জলির সঙ্গে অনিন্দ্যর দেখা হয়। এবং অনিন্দ্যের মনে হয় তার নীলাঞ্জলি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তাই নিজের অজান্তেই অনিন্দ্য অঞ্জলিকে প্রশ্ন করে 'অঞ্জলি কোথায় গেল তোমার সেই নীলাভ চোখের স্বপ্নালু দৃষ্টি, যা দেখে একদিন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম'। অঞ্জলি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সে নীরব দৃষ্টি নিয়ে অনিন্দ্যর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখ জলে ভর্তি হয়ে যায়। অনিন্দ্য বলতে থাকে 'আমি একটা রিপোর্টারের চাকরি করছি। কই তোমার বিয়েতে যেতে বললে না তো'- কিন্তু তখন অঞ্জলি পাঁচ বছর পেছনে চলে গিয়েছিল। "অঞ্জলি, তোমার নীল চোখ দুটোর আশ্চর্য সুন্দর দৃষ্টি আমায় আকর্ষণ করেছে। তাই আজ থেকে তুমি শুধুই আমার নীলাঞ্জলি" অনিন্দ্যর ঝাঁকানিতে অঞ্জলির চমক ভাঙে এবং সে অনিন্দ্যকে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে।

যথারীতি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে অনিন্দ্য অঞ্জলির বাড়িতে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে বাড়ির সামনে ভীষণ ভীড়, ভীড়ের কারণ জানবার চেষ্টা করে জানতে পারে সঞ্জীব অঞ্জলিকে মারবার চেষ্টা করে। কিন্তু অঞ্জলি প্রতিবাদ করেছে, লড়াই করেছে। তাই সে সঞ্জীব নামক অর্থ-পিশাচের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে। কিন্তু তা পারলেও এখন সে জীবন ও মৃত্যুর

সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। এই চরম বিপর্যয়ের সময়ও তার শ্বশুর বাড়ির লোকেদের তার জন্য চিন্তা করার মত সময় নেই। এই সময় অনিন্দ্য রামপ্রসাদের (বাবা) পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তার নীলাঞ্জলিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং তার চেষ্টা ব্যর্থ হয় না। অচেতন অবস্থায় অঞ্জলি বলতে থাকে "অনিন্দ্য আমি তোমায় ভালবাসি আমি যে শুধুই তোমার"। তাদের সুপ্ত স্বপ্ন দিবালোকের প্রকাশ্য আলোয় পরিপূর্ণতা লাভ করে। রামপ্রসাদও তাদের সমর্থন করেন।

সুতরাং গল্পের এই চরমতাই প্রমাণ করে সেকালের নিরুপমাদের সঙ্গে একালের নিরুপমাদের পার্থক্য। তারা জানত না বিদ্রোহের ভাষা প্রতিবাদ করা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। কিন্তু একালের নিরুপমা ওরফে অঞ্জলি সে শিখেছিল প্রতিবাদ করতে। তাই তো তার জীবনের চরম বিপর্যয়ের পরও আনন্দের রেশ পাওয়া যায়। তাই তো অনিন্দ্য তার হারানো নীলাঞ্জলির মধ্যে আবার নতুন করে নীলাভ চোখের স্বপ্নালু দৃষ্টি খুঁজে পায়, নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে পায়।

মা ও সন্তানের সম্পর্কে ফাটল, সন্তানের একাকিত্ব

তিলাঞ্জলী ঘোষ, বাংলা অনার্স

মানুষ পৃথিবীতে একাই জন্ম নেয় এবং মৃত্যুর পরপারে তাকে একাই যেতে হয়। শুরু বা শেষের পথটুকু মানুষকে একাকী অতিক্রম করতে হলেও সে সারাজীবন এই একাকী পথ চলার দুঃসহ বোঝাকে বয়ে নিতে পারে না। তাই সে জীবনের প্রতিবাঁকে, প্রতিমোড়ে বেছে নেয় বিভিন্ন অংশীদার, যারা তার একাকিত্ব বন্টন করে নেয়। যারা নানা প্রকার সম্পর্কের প্রতিভু রূপে মানুষের জীবনে আসে। অনেক সময়ই মানুষকে সঠিক প্রতিভু নির্বাচন করে নিতে হয়। যে তার একাকিত্বের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারবে। মানুষের জীবনে বিনা নির্বাচনে যে অংশীদারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি হল, সে হল মা। নিজের গর্ভে দশমাস ধরে লালিত সন্তানের একাকিত্বের মর্মে প্রবেশ করা তার পক্ষে এতটুকুও অসম্ভব নয়। কিন্তু আজও তো মায়েরাই সন্তানদের জন্ম দেন। তাহলে তাঁদের এই একাকিত্বের দুঃসহ বোঝা বহন করতে হয় কেন? কেন তাঁরা হয়ে পড়ে হতাশা? কারণ আজ মায়েদের হাতে সময় নেই। কেউ নিজের স্বাবলম্বিতার পরিস্ফুটন ঘটাতে ছুটে যান চাকরির উদ্দেশ্যে, আবার কেউ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে উপভোগ করার উদ্দেশ্যে ছুটে যান। তাই বলে মায়েরা চাকরী করবেন না এ কথা বলছিনা। জীবনে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। কিন্তু সংসারে নারীদের যে ভূমিকা তা অনেকাংশেই পুরুষ পালন করতে পারে না। একজন সন্তানের তার পিতার চেয়েও তার মাতার বেশী প্রয়োজন হয়। শত হলেও নাড়ীর টান অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য আজও সেই নাড়ীর টান কেউ অস্বীকার করেন না, কিন্তু ব্যস্ততম জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তাঁরাও হয়ে উঠেছেন ব্যস্ততম। সন্তানকে নিয়ে দেখার প্রতি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা আজ তাঁদের ব্যস্ততম জীবন যাপন ধারার নিচে চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু একজন সন্তান প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে তার মাকেই। সে তার সমস্ত আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটাতে চায় শুধু তার মার কাছে। একমাত্র সেই আছে যে তার হৃদয়ের প্রকৃত মর্ম স্থলে প্রবেশ করতে পারে। মায়েরা যখন জীবন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েন তখন তাঁদের সন্তানেরাও প্রভাবমুক্ত হয় না। সারাদিন ব্যস্ত তম জীবনের পর যখন তাঁরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরেন ঐ পথ চেয়ে থাকা শিশুটি মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাছ থেকে সারাদিনের ভালোবাসা আদায় করে নেবার চেষ্টা করে, বায়না করে নিজের অধিকার প্রকাশের চেষ্টা করে, তখন অনেক সময়ই মায়েরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাদের বকে বিরত করেন ঠিকই কিন্তু নিজের অজান্তেই সন্তানের চেয়ে দূরে সরে যান। ক্রমশঃ শিশুরা এই একাকিত্বের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকে। একাকিত্ব নিজেকে ভাগ করে নেবার অংশীদার হারিয়ে ফেলে। শিশুদের জীবনে তখন শুধু আবর্তিত হতে থাকে সকালে স্কুল, দুপুরে আয়া, আর বিকেলে পড়াশুনা। আর সর্বক্ষনের সঙ্গী তার একাকিত্ব। যা একসময় তার ক্ষুদ্র শিশুমনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে। তখন সে সকলের চোখে হয়ে পড়ে অবাধ্য, অসভ্য। সকলের কথা কম শোনে, তর্ক করে। যা নিয়ে আজ সমস্ত মায়েরাই অল্প বিস্তর চিন্তিত। যে সন্তানকে দশমাস গর্ভে লালন করেছে সেই সন্তানের মনই আজ মায়েদের কাছে দুর্বোধ্য। শুধুমাত্র চাকরীরতা মায়েদের সমস্যা নয়। গৃহিণী মায়েদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটছে না। এর মূল কারণ হল মায়েরা আজ সন্তানের মর্মে প্রবেশের পথ হারিয়ে ফেলেছেন। এর ফলে ক্রমশঃ মা ও সন্তানের সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। একাকিত্ব সন্তানকে করে তুলছে হতাশ, অবাধ্য। মায়ের প্রতিমুহূর্তের অন্যের সন্তানের সঙ্গে নিজের সন্তানের তুলনা তাদের মধ্যেকার ব্যবধানের পাঁচিলের এক একটা ইঁট স্থাপন করেছে। সন্তানের লালন পালন কি তাহলে মায়েদের কাছে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে? আজ কিছু সংখ্যক মায়েরা চাকুরীরতা, কাল যখন অনেকে হবেন, তখন কি এই ব্যবধান আরও বেড়ে যাবে? সন্তানদের একাকিত্ব কি তাদের নিজেদের বহন করতে হবে? আমার মনে হয় সময়ই এই সকল প্রশ্নের সঠিক ও যোগ্য উত্তরদাতা।

Sad Song Blues

Arindam Sen
Chemistry (Hons)
B. Sc. Ist year, Roll - 311

I have walked these beaches
tried hard, hard to keep the
ocean's water
Within the clasp of my palms
Dust and memories, linger. And I
have mercifully aged.
Harsh sand grains rub the ugly knots of my
hands.
Have I learned any? Am I wiser for
the sojourn in the sand ?
Never a seeker ofter knowledge, I
have buried my toe in sand,
pushed the next shaky step into
salt water,
weed, grime, and a bit of life.

I loved, merely
I never found such a thing just love,
Not pure, never simple. But, who knows ?
Yes, the stars danced as the winds
carried the ocean's wrap.
I was witness to the moon raking
in the wild, wild harvest.
The waves licked the oceans edges
on moonless lights,
the slow drudgery of a passionate act.
It is better to die than to live by habit.

The joys are there
A life to live. And, love ?
The wise man rolls on sand,
gathers no moss, no sparks of new knowledge.
There is no such pure, on simple stuff.

★ ★

SHOULDER THE WORLD

Sudarshan Banerjee

Tomorrow the morn shall bring
the results of today's toil
Should we wait for the day to break
Or be ready with sabre and foil.

For all we know it might not be
That which we do desire,
So what, I say, lets start afresh
Rekindle within us that burning fire

Day alter, might be too late
late night decide things for us
Let us not while away the time
While the cause is ripe and means are just

For what is all this sweat and strain ?
For what, I ask, this struggle anew ?
If it makes you not humble and kind
If it makes not a man out of you.

The earth and sky have been standing long
It has taken centuries to make,
The weight, though heavier than before,
Let's five poor apollo a break.

Hail King Kapil !

King Kapil Devji, hail to thee for joining
the company of Hadlee.
The going was tough and not easy,
But you got there even-tually.

You have given the nation a treat,
By your truly magnificent feat,
Master of cut and swing,
Your bowling has a lethal sting.

Your achievement is very unique,
It is simply ' tres magnifique.'
For the cricket world is witness,
To your superb to physical fitness.

With a smooth delivery action,
Your bowling is poetry in motion,
A one dayer or test
You are the best.

Your batting is not from the book,
The way you pull and hook,
May not be a connoisseur's delight,
But it sure gives opposition a fright.

Who can forget the Zimbabawe innings,
Which was beyond ima-gining,
A grim and desperate situation,
Become a winning position.

And soon the World Cup was ours,
It was beyond our powers,
Said many a doubter and critic,
But they reckoned without your magic.

The maestro of the leg cutter
None can do it better,
with a ball old or new,
Your direction is always true.

For your acute direction ,
All the batsman had to see the way of
Pavillion
A royal salute to thee,
The only and only one KAPIL DEV JI !

Amar Nath Mishra
B A Ist year (Hons)
Roll - 73

★ ★

DNA Finger Printing

Bhaskar Dutta
B.Sc. IInd year Zoology (Hons.)

The latest tool in forensic science is the DNA finger printing. It is one of the most dramatic developments in the application of genetics to the welfare of human beings.

The structure of DNA is well known to any student of Biology. The double helical structure of DNA molecule was first put forward by James Watson and Francis Crick in 1953. It is also known that DNA is a carrier of a huge sum of genetic information. They supply every instruction needed by a cell to carry out all physiological functions normally.

Though the long stretches of this DNA remain same in every person, certain parts of them vary strikingly from person to person. In these areas, the junk DNA repeat themselves again and again. Junk DNAs are those DNAs which have no specific important function. It is better to say, it's function is not clearly understood. These regions establish an identify to a particular person and because of this, no two people can have exactly the same pattern of DNA. Though there are exceptions in identical twins, when such a DNA is displayed, individual patterns come out clearly, much like the 'finger prints' and hence, it is called 'DNA finger printing'.

For DNA printing to be done, cells containing nucleus, such as WBC, sperm etc are taken and treated with hypotonic solution. In this condition, the cell along with the nucleus burst open releasing the DNA strands. The strands are shipped into fragments. Electrophoresis is done to align the DNA pieces according to size. This pattern of DNA is

now transferred to a nylon sheet and is exposed to radioactively tagged probes. These probes attach themselves to the DNA areas and when placed against a X-ray film, black bands are seen where probes remain fixed. This pattern constitutes the DNA print.

DNA finger print, being unique for every individual, is increasingly used in the detection of crime, specially in rape and murder cases. Thus it is the most powerful forensic tool.

THE TRUE FRIENDSHIP

Ranjan Mukherjee,
Class - XI Arts,
Roll- 32

Friendship is an art. Unremembered acts of kindness and of love which lend such a charm to life are the basic qualities of an ideal friend. There are times when friendship is tested sorely. Friendship should be able to endure these tests.

Ritesh Dutta and Goutam Basu were friends. They both were ready to sacrifice their lifes for each other. Their friendship was just a case of birds of the same feather flockng together. They both used to study in Romesh Mitra High School at Khidderpore. Ritesh's father was a doctor of Cardiology department at N.R.S. Hospital and Goutam's father was a clerk at a government office in the City.

Ritesh and Goutam were good in studies. They both got first division marks in the I.C.S.E. They were also good singers, they had analogized their school in various competition held outside and brought many prizes to school. The both took science as their subject and admitted themselves in Vivekananda College. In college also they retained their cultural dowries and friendship. But there was a change in Ritesh's attitude as well as in his academic career. He was not anymore good in studies and concentrated only in music. He wanted to become a playback singer and to record a cassette of his own. He was in trap of some astute and dishonest people who assured him that if he mannaged to pay Rs 25,000/- to them, then they would satisfy hiş desires. Goutam knew those people, because they also asked him to pay more than Rs 25,000/- for a recording and his publicity. But afterwards he came to know, that those people were swindlers and flatterers. Goutam tried to make Ritesh understand, but Ritesh refused to listen him. He thought that Goutam would not allow him to achieve his goal. He ignored him from that day. After few days Goutam went to Durgapur at his aunty's house.

Five years had passed of their dispersal. Goutam had become a doctor and he so had come to his old selttlement at Bishu Babu lane at Khidderpore. He at once ran to meet his friend Ritesh, but when he reached there he found no one at home. He heard from one boy that Ritesh was admitted at N. R. S. Hospital because he met with an accident. When Goutam went there, he saw Ritesh's parents were sitting in a broody mood. Goutam was startled to see Ritesh's mother wearisng a white saree. She had become a widow, There was not time for Goutam to express his sorrow because Ritesh was on his last leg. His condition was punitive. Three bottles of 'A' possitive blood must be arranged within 35 minutes. There was no 'A' possitive blood in the Blood Bank. Goutam gave his own blood because he had a blood of same category. But the demand was not fulfilled. After few minutes he arranged some more blood which helped Ritesh to survive.

Afterwards when Ritesh got back his sense and heard about Goutam's philanthropic nature, he was ashamed. The tears which he shed that day washed away all the dirt of misunderstanding between the two friends.

MUSIC IN THE BAROQUE SOCIETY

Somraj Dutta, II year, B.Sc.

The word 'Baroque', according to modern historians, indicates simply, a style of art. One of the deep rooted features of this Baroque art in the Baroque society was the depiction of 'action and movement' in every field of its manifestation. The Baroque art was also fancied for its tremendous 'fusing' capabilities in terms of styles and ideas. Actually, as we are more concerned with the style of music in the Baroque period, one cannot, thus, deny the fact, that it was at this period, that, the art (of music) was exploited, at its best.

The Baroque music style flourished during the century and a half from 1600 - 1750. Though composed of three phases, the later phase of Baroque music (1680-1750) is best known today, as, it had the quintessence of a new sound and concept, in its form.

Mood (also referred to as Affection in that period) is one of the integral parts of music. Interestingly in the Baroque style of music, there was the presence of only one basic mood which was maintained throughout the text. Emotional states like JOY, GRIEF, AGITATION were thus some of the basic moods in Baroque music (as in other musical forms too). The maintenance of a single mood throughout a text, creating a continious drive, was undoubtedly supported by a single rhythm which was also repeated throughout the text. Similar mood and rhythm throughout a text thus gave rise to a compelling drive and energy. Apart from the above, Baroque music was also characterized by the sequence of repeated melody by which is ensconced a feeling of continuity in the taxt. Thus a musical price in the Baroque era contained a strong melodic sequence, i.e. successive repetition of a musical idea in higher and lower pitches. The late Baroque period is, also, respected today, for its inclination towards Polyphonic (parallal maintenance of two melodic lines) textures, unlike the early period, which laid emphasis more on homophony. Dynamics, also had its own speciality in the music of that era. The dynamics, like the melodie and rhythmic outlines, remained continuous for a stretch of time. But when it did change, it changed in a sudden and sharp manner. Thus gradual changes in crescendo and decrescendo were not a feature of the music.

The Baroque period, as a whole, gave birth to a category of audience who craved for new music. People were basically lazy and music was naturally their main source of diversion. At the royal courts, the music composers were paid better than their counterparts at the church. Children were also tought music at the church schools and eventually there were very few public concerts. Now, how could one become a musician in the Baroque period. Often the art was handed over through parenthood to the offspring or there were facilities of learning music and then pass tough and thorough examination.

At this pons of discussion the reader might wonder, quity logically too what was so special about the Baroque era in the context of today's music and its infrastructural extravaganza. Well, the Baroque era not only gave birth to a new definition of Classical music but to some 'Divine' musicians whose contribution in today's classical generation is unquestionable. Some of them are George Frederic Handel, Johann Sebastian Bach, Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Arcangelo Corelli and Antonio Vivaldi.

So, could it match itself with the drumbells of the 21st Century ?

Any more questions ?

A Journey to the Kumayun Range Of Himalayas

Amritendu Pramanik.

Adventures, touring, travelling, fond of beauty and ecstasy are among the instinctive nature of Bengalis. We descend down to the sea shores, climb up the mountains, run to the jungles in search of the creation that the adroit nature has craned on the Earth. To enjoy such grandeur of nature we, too — my parents and my younger sister Dinka set off our house in the vacations. It was the year 1991, my Madhyamik Examination was knocking at the door, and we planned our next tour to Pindari, Kafui and Sundardonga glaciers of Kumayun range of Himalayas.

On 18th of April we started our journey from Howrah and reached Lucknow on April 19th. On the very same night, we set off for Haldwani by Nainital Express, a narrow gauge train. The next morning we arrived Haldwani. Then after it was a long nine hours bus journey to Bageshwar. Bageshwar was a little city from where most of the trekking routes start, a junction between the tourists and the guides of the trekking route. Here, we appointed Denendra Prasad as our guide. Necessary rations were taken and luggages were separated for every member. We stayed the night at Bageshwar, for the most intoxicating part of our trip was going to start the day after.

On 21st April, first we started from Bagheswar by bus at 11-45 A.M towards our destiny, Song. The bus route went through two big markets Bharari and Kapkot. Bharari is the place from where trekking route starts for Nandadevi Peak (7817 mtrs.) We reached Song at 3 `0' clock in the afternoon and resumed our journey towards Loharkhet within fifteen minutes.

Now the real trek starts by means of Walk. It was 7 Kms from Song to Loharkhet. Loharkhet was at an altitude of nine thousand feet from the sea level and a bit chilling weather was reigning over the place. We had to put on our inners and sweaters to resist the cold. At night the temperature decreased to nearly five degree celcius.

On the next morning, we appointed a porter, Pushkar Singh. We had our breakfast and started towards Dhakuri. This trek was 9 Kms, from Loharkhet to Dhakuri. Dhakuri was at an altitude of thirteen thousand feet above the sea level. Certainly, the route was precipitous and steep rocky trek. Myself and Pushkar were leading the group and went through two short-cut routes which were pretty dangerous. At one point, we had to go through a sloping rock of 15 mtrs. The rock was inclined at nearly 75° to the mountain side and on the either side there was a depression of 200 mtrs. The rock was slippery due to a stream of water and algae grown on it. I reached Dhakuri at 12-40 hrs. and others followed me approximately after an hour. When we reached Dhakuri, it was raining accompanied with stormy winds. It was so chilling that we had to take alcoholic beverages to make ourselves warm.

We resumed our journey after the lunch at half past one `O' clock and reached Khati after a trek of 8 Kms. Khati was slightly lower than Dhakuri, at an attitude of 11000 ft. We stayed the night at Khati. In between the time we were informed that the route of Pindari, after Dwali had been completely demolished and due to worse weather, rain, storm and snow fall, no one can reach Pindari point. Same is the case of Kafui. Most of the trekkers were returning from either Khati on Dwali.

The very next morning we decided to go as far as we could. So we started in the morning at 8 -10 A.M. It was a trek of 11 kms from khati to Dwali. On the way the weather suddenly became worst and it started raining. At one place, the path was totally de-

stroyed and we had to crawl like lizards to propagate further. We reached Dwali at quarter past mid-noon. At Dwali, we were informed that the route further was blocked due to land slides and big ice-glaciers. And till that date of that year no one person could reach Phurkia, the nearest point of Pundari Zero point. They also informed us that the Pindari zero point had retreated to only 2 kms. from Dwali. Dwali was the point, from where different routes run simultaneously, one towards Pindari zero Point Phurkia and the other towards Kafni zero Point. After lunch, the weather worsen. Devendra insisted us to stay at Dwali and so we decided to stay. In the night hours we could hear the terrific storm and shivering sounds of breaking of ice glaciers and land slip too.

On the 24th morning, we decided to climb up Kaful zero Point which was 13 kms. ahead of Dwali. Earlier we were informed that no could reach Kafni Zero point this season. So I was a bit charged and determined to climb up the last point. The route was full of natural beauty with white ice glaciers at one side and red Rhododendron flora on either side. However, papa, ma and Dinka decided to stay after climbing 10 kms, as papa had an aching leg and Dinka much frightened. So myself and Devendra went through and at last reached the zero point at ten minutes past mid-noon. But then snow fall started and we had to return as soon as we could. My mind was glowing with joy as it was a triumphant deed for me being the first one in that season to climb upto Kafni zero point. We reached back Dwali at around half past two. The whole day went raining and stormy weather persisted.

The next morning papa, ma and Dinka decided not to go towards Phurkia but I was firm on my decision. So myself and Devendra sit off for the last point we could reach. After some time I could realise that it was one of the hardest treks I had ever did. Unfortunately since time was a bar, we went till Joyarpani 4 kms ahead of Dwali and a last good bye to Pindari. But I was rater glad that only one could reach Joyarpani before us, that season. However, we came to Dwali at half past eight "o' clock and then all of us started our journey back towards Khati.

That very day we reached Dhakuri at eve and stayed the night there. The next day we came lack to Bageshwar and that is how one of our hillarious expedition to the Kumayun range of Himalayas came to an end.

Sea Cadet Corps Camp - A Thrilling Experience

Dibyendu Maity
XI - A - Science
Roll - 205

As far as I remember I was then studying in Class Six when I came in contact with the Sea Cadet Corps, which is a branch of the Indian Navy for boys and girls. This particular organisation renders trainings like swimming rigging, shooting, rowing, and also other Marine trainings such as life in a ship etc. and the cadets are also taken for camps at least once a year either in Delhi, Bombay, Cochin, Visakhapatnam or Andaman & Nicobar islands.

It was my friend Asif who first informed me about S C C. I got very keenly interested on hearing Asif and brought this fact to my father's notice who also interested in getting me admitted there.

training of S.C.C. is conducted) and met Sub Lieutenant S. Ghose who acquainted us with the rules of S.C.C. and gave us a form to fill up the necessary data required and cash of Rs.500/- for my uniform, shoes, belt and cap. The uniform there was typical. The Rig 7 consisting of a blue short and white shirt to be worn on ordinary Sundays and the Rig 6 consisting a white short and shirt to be worn on the first Sunday of every month.

I started usual classes at I.N.S. Netaji Subhas where the subjects were not at all same which we study in schools. Here it was march past, morse code (a communication from one ship to another through light). Sema four (Which is a message given by hand) and swimming, shooting and also rope work. Within a span of three months I became conversant with each and every thing and again after 3 months, we had a test for promotion from new entry to ordinary seaman. I passed the examination and became an ordinary seaman. In S.C.C. one can attain a rank to a very high level. When a boy first enters he is then a Recruit and after examinations his ranking begins. He primarily becomes an ordinary seaman, then a able bodied seaman, leading seaman, Petty officer, Instructed petty officer, Mid-shipman, Sub-lieutenant, Lieutenant, Commander, and then of course a Commodore.

One day as we were having usual classes, we were informed by our respected sub-lieutenant that a camp has been arranged at Cochin (Kerala) for 10 days. Almost every body was interested in the Camp. But on the next Sunday it was found that only seventeen boys including me had the permission for going to Cochin. Anyhow we deposited the necessary amount of money required for purchasing tickets, reservation etc.

It was decided that we had to leave Calcutta for Cochin on the 17th of May by the Howrah–Cochin Express via Vishakapatnam. 17th approached and I left Calcutta. The journey was for 3 days and it was very comfortable and thrilling. On the 21st at about 0001 hrs. (Naval time) we reached Cochin and boarded a truck which had been sent by Lieutenant Commander S.Ramachandran of I.N.S. Venduruthy (as we gave INS Netaji Subhas in Calcutta). We were on board the truck and reached our destination sharp at 0130 hrs. Food was kept ready which was relished by us within a few minutes and then every body sprang into their respective hammocks out of fatigue.

The next morning we were all awake by 0006 hrs. and all went to the canteen for tea. After having tea we were informed that our camping activities will commence on and from the next day i.e. the 22nd. But still we were given some work to do. Four boys were told to clean the hall in which we had slept last night and the others were sent in to the scullery to wash various utensils and some were told to clean the garden. Thus it can be said that all the time the cadets were engaged in some sort of work.

The next day with the sound of the bugle we all got awake sharp at 0005 hrs. and reported to physical training officer for physical exercises in which we were instructed to perform certain exercises. First of all we had to run a course of 1500 metres, then, after taking enough breadth started certain exercises such as push-ups, climbing through knotted ropes and also lifting small weights. To add fun, our P.T. Officer also sometimes ordered us to do frog jumps.

At about 0006 hrs. we returned to our quarters, bathed our-selves and then served ourselves with tea. Then again at 0007 hrs. we dressed ourselves with necessary uniform and went to the canteen for breakfast. Then at 0008 hrs. all of us along with our Senior Officer's of INS Netaji Subhas and that of INS Venduruthy marched to Cochin shipyard about 2 Kms from our quarters.

On reaching Cochin shipyard, we started march past with .22 rifles and also which the BSF jawans of our country carry. After march past we were given a bit of rest and then classes on sema four, rigging, morse code proceeded. We returned to our quarters at 1300 hrs. and at 1330 hrs. went for lunch. Then after taking rest for a while at 1500 hrs. we either went for swimming, rowing or shooting. Now swimming and rowing was a common activity to us but shooting was altogether a new class to all of us. We were taught shooting by Master-in-chief, Petty officer Shyam Sundar Singh Rajput who had been called from Delhi to teach us shooting. He had an excellent hand in shooting and was also very gentle and kind to the cadets. First of all we were given simple airguns while we were being taught the different positions to be taken while taking any target and then after wards we were provided with point 22 rifles with 10 rounds of bullets to target at a fixed point within a range limit of 125-150 yards. As far as I remember the first day I was unsuccessful to score any point but later on this began to improve by the help of Mrs. S. Rajput's training and my labourious practice.

Sometimes we also went for swimming and also rowing at the Cochin shipyard, then to INS Garuda, the aeronautics section of INS Venduruthy for ride on helicopters and also to the meteorological centre for certain knowledge on preparing weather maps and occasionally to the Radar Section. Thus at a very young age, boys and girls in SCC can acquire a good deal of knowledge. This was actually our daily routine for ten days.

As we were busy with our training a warship INS Ranjit made a halt at the water base of INS Venduruthy. We were totally dazed on witnessing the ship. Instructed Petty Officer Geetam Ghosh became our guide and took us to the Ship. Being on board the ship, all of us started to look at the war instruments. The ship was 178.5 mtrs. in length and had two anti-submarine rocket launchers, one tank for destroying warplanes and also other weapons for firing scud missiles. The ship also had five mig warplanes and few warplanes of H.S. 7.4.8 category.

In this way ten days of our camp passed away and now it was our time to be free. On the 28th May we went to an archaeological centre at Ernakulam where we found different coins of ancient India, clay utensils, dresses of man and woman etc. Then we also went to the Broadway Centre at Cochin a very big shopping centre for buying sandal wood carvings and other sophisticated decorative articles made out of shells of snails. We also paid a visit to the zoological gardens of Kerela and other places too.

Our liberty period ended and then it was time to leave Cochin. Many cadets who were homesick were very eager to return home. So we again became busy in packing our luggages as we were to leave Cochin on the 3rd of June, by the same train which brought us to Cochin from Calcutta.

On the 3rd at 1630 hrs. we were on board the train and started for Calcutta. Finally we reached Calcutta on the 6th and our heart pounded in excitement when we thought to meeting our beloved parents once again. Coming out of Howrah station I took a taxi and started for home.

The camp organised by S.C.C. was wonderful. All the cadets in the camp had acquired a chance of exhibiting their talents and at the same time we were able to know a lot about war instruments, radars etc. and also gathered an experience on a camp, the thrill of journey and mixing with people who speak in different languages.

Before I conclude, I feel, I should request the youth of India to join any of such programmes as a part of building our nation.

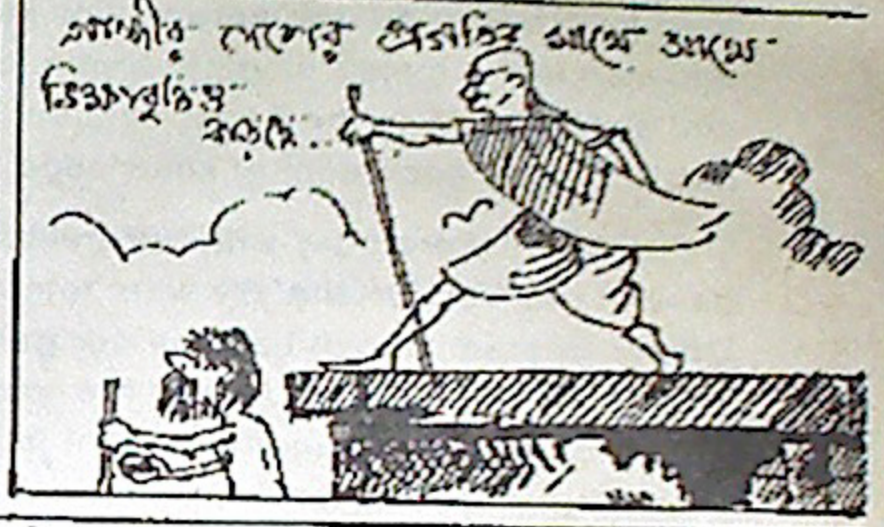

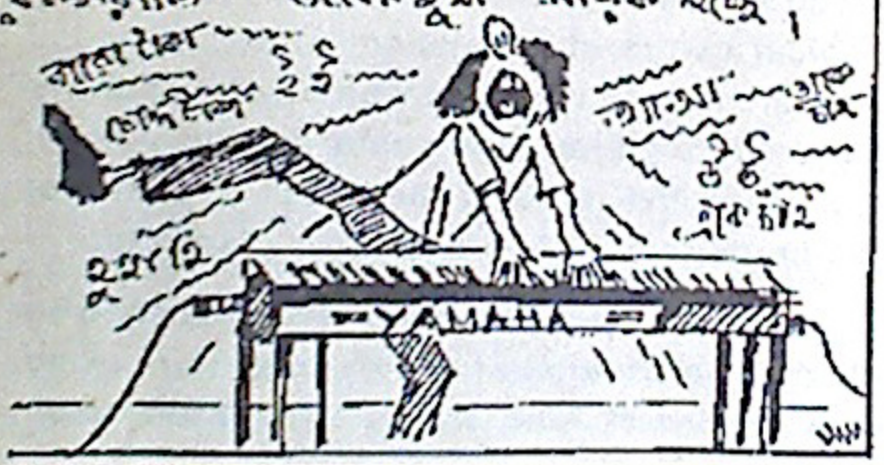

ময়ূখ মজুমদার (একাদশ)
দেবতার NEWS OF কলকাতা 94-95
নমস্কার। বিশেষ বিশেষ খবর হল। যা জেনেছি আর কিছু দিন পরেই স্বর্গে, কলকাতাও আসবে, তাই কলকাতার অবস্থা ঐরকম...
এখনো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অসমালোচনার অন্ত নেই। এবছর আরো বেশিরকম হচ্ছে.....
গান্ধীর দেশের প্রগতির আগে আগে
একদল গায়ক পাশ্চাত্য গান নকল করে উদ্ভট জীবনমুখী গায়ক হচ্ছে।
YAMAHA
ডাইনোসোর SCIENCE CITY তে জেগেছে। আলো দিচ্ছে।
বস বস কেমন আছ?
এই চলছে
FASHION এর দরুন ছেলেরা বড় চুল রাখছে। আমাদের এখানকার অসুরের থেকে কিছু কম নয় ওরা॥
FASHION
কলকাতায় সুস্থ থাকার জন্যে GAS MASK বিক্রি শুরু হবে এই দেশে
PORAT